ভোজপাল

অনিল রায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৫৩

উৎসর্গ

দিদিমাকে

ভূমিকা

ভোজপাল…না, ভোপাল…বা ভূপাল। কেমন করে রূপ নিল এই নাম, কে জানে! সত্যতা নিরূপণ কঠিন কর্ম।

বিশাল ইতিহাস ভূপাল তালার। জীর্ণ দুর্গ প্রাচীর ছুঁয়ে রয়েছে সরোবরকে। দশ শতকে রাজা ভোজ বাঁধ দিয়ে বাঁধেন বেগবতী নদীকে আর তৈরী করেন দুর্গ প্রতিরক্ষার জন্য। ভোজপুরের শিব মন্দিরের কালজয়ী রূপ আজও অটুট। —স্থাপত্য বিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন।

ভূপালের অদূরে মজবুত রায়সেন কেল্লা পাঠান ও মোগল সম্রাটদের কব্জা হয়েছে। হাত বদলও হয়েছে অনেকবার।…এর একটু দূরে মহুয়ার জঙ্গলের পাহারার মধ্যে হাজারো বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বিরাজ করছে বিশ্ববিখ্যাত সাচী স্তূপ। এর পত্তন হয় বিদিশা নগরী থেকে।…কালিদাস হতে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাকে নিয়ে কাব্যের ছন্দ গেয়ে গেছেন।… দু' হাজার বছরেরও পূর্বে, অতীতের বিদিশার পাশে গড়ে উঠেছিল বেসনগর। বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈশ্যনগর বলেও উল্লেখ আছে এর এই বৈভবশালী নগরেই অশোক পত্নী থাকতেন। ওঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে এখান হতেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহল পাঠানো হয়েছিল।

সময় বদলে গেছে। মোগল যুগের শেষে, এক উচ্চাকাঙ্খী পাঠান, দোস্ত মহম্মদ, ভূপালের শেষ হিন্দু রাণী কমলাপতির কাছ থেকে ভূপাল হস্তগত করে আধিপত্য বিস্তার করেন।…তারপর রায়সেন, বিদিশা নিজের আওতায় আনেন। বৈচিত্র্যে ভরা ভূপাল রাজগদীর ইতিহাস। মারাঠা এবং ইংরেজও অনেক খেলা দেখিয়েছে ভূপালে। …এমন এক সময় আসে যখন ভূপালের গদীতে মহিলারাই শাসন দণ্ডের কর্ত্রী ছিলেন। ক্রম করে চারজন মহিলা পরপর রাজত্ব করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সেকন্দার বেগমের কঠোর বাস্তববাদী ভূমিকা আশ্চর্যান্বিত করে। …বর্তমান ভূপালের সৌধবলীর, হর্ম্যরাজির এবং সুবিশাল মসজিদের সৌন্দর্যের অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন কল্পনা বিলাসী নবাব শাহজাহান বেগম। কিন্তু তাঁর শেষ জীবন দুঃখের মধ্যেই কাটে। প্রেম, গুপ্ত হত্যা কলুষিত করে অন্তঃপুরকে।

রাজা ভোজ যদি ভূপালে বড় বাঁধের নির্মাণ করেন...তবে পুল পোক্তা নির্মাণে মন্ত্রী ছোটে খানের কৃতিত্ব...আর সাঁচীর অপূর্ব বাস্তুকলার কাহিনী...বেসনগর পরিত্যক্ত হয়ে কেমন করে বিদিশায় মিশে যায়,...রায়সেন কেল্লার শাসকদের মর্মব্যথা, কেমন করে তাঁরা খিলজী ও পরে শের শাহের সাথে লড়তে লড়তে জীবনপাত করে এবং অন্তঃপুরে রাণী দুর্গাবতী ও অন্যান্য নারীদের আত্মত্যাগ—এইসমস্ত কাহিনী পুষ্প চয়নের মত সাজানো হয়েছে এই পুস্তকে।

বৌদ্ধ যুগ হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে সারিবদ্ধ রূপে সাজিয়ে গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করার দুরূহ প্রচেষ্টা করেছি। পাঠকগণের ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে। আশা করবো আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা ভূপালের সীমা অতিক্রম করে বাংলার পাঠকদেরও আনন্দ দিতে সমর্থ হবে।

—লেখক

১ পঞ্চশীল,
ভূপাল.

১

ধূসর সন্ধ্যা। আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনা। সূর্যের গোল বলয় ঠিক দেখা যাচ্ছে না। তবে সূর্যকিরণের ছটা, মেঘের ভিতর দিয়ে বহুমুখী জাল বিছিয়ে ধরেছে। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ এসে কিরণকে সীমিত করে শ্যাওড়া গাছকে তীর্যক আলোতে স্নান করায় ক্ষণিকের জন্য। এরপর শ্যাওড়া সারা জঙ্গলের সাথে একাকার হয়ে মিশে যায়।

জঙ্গলের পাশে, দালানের ভিতর দিয়ে, নিকটের জলধারার শব্দ শোনা যায়। ভূপালে, হৃৎপিণ্ডের মত বিশাল জলাশয় থেকে বাড়তি জল বের হয়ে যাচ্ছে দুই ছোট পাহাড়ের গহ্বরের ভিতর দিয়ে ভদ্‌ভদায়। এরপর ইতঃস্তত বিছানো ছোট বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে, জল মসৃণ পাথরের বুকে খানিকটা গড়াগড়ি দিয়ে, সশব্দে নিচে ঝাঁপ দেয়। জলধারা শেষে কালিয়া সোত নদী রূপে সমতলে এঁকে বেঁকে দৌড় দিয়েছে।

বর্ষায় এখানে নদী পারাপার হওয়া দুষ্কর। তবে মানুষ নামক প্রাণী কোনদিনই কোনো কাজে হার মানেনি। ঘোরা পথে এখানে আসে। উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন। নদীর তীরে মনোরম স্থানে অবসর কাটানো।

অনুচ্চ পাহাড়ের কোলে, নদীর বুকের পাশে, সাদা রঙের এক দালান। তার চার কোণে ছোট ছোট গুম্বুজ। নদীর বুক হতে, পাথরের পর পাথর সাজিয়ে গড়া এই নাতি বৃহৎ দালান। বারান্দা গোছের একটা অংশ নদীর পাশে ঝুলছে। ভিতরে হল ঘর। দুটি থাম ছাদকে ধরে আছে। হলঘরের দরজা পার হলেই বারান্দা।

দালানের পিছনে পাহাড়ী টিলা দৃষ্টি আটকায়। পাহাড় ছোট বুনো গাছপালায় ঢাকা। মাঝে মধ্যে বড় গাছ দাঁড়িয়ে থেকে ছাতার মত বাহার ধরেছে।···এর ভিতর কোথাও কোথাও গুহা আছে। কিন্তু সহজে চোখে পড়ে না। হাজার হাজার বছর পূর্বে নাকি গুহা-মানবেরা ছিল। নৃতত্ত্ববিদরা তাই বলেন। এখন বন বিড়াল আর শেয়ালের আস্তানা। নদীর ওপারেও জঙ্গল। খুব ঘন নয়। নানা বন্য জন্তুর আড্ডা। সকলেই ভূপালবাসীর পরিচিত। নদীর কুণ্ডে রাতে জল

খেতে আসে। অন্ধকারে, হঠাৎ চোখে নীল আলোর জ্যোতির চমক জ্বালিয়ে, নিমিষে ঝোপের ভিতর উধাও হয়।

বর্ষায় উচ্ছ্বসিত নদীর জলধারা গম গম শব্দ করে চলে এক নাগাড়ে। আরও জল ঢালে কুণ্ডের মাঝে। যত জল ততো বল। কিষাণের বুকে ভরসা জাগে। ধরিত্রী রজস্বলা হবে। ফলদান কর.ব।

বারাদরী।...একটি দালান। ভূপালের এক বেগম সাহেবা তৈরী করেছেন। রাজা, নবাবদের সখ বলে কথা। জনপদ হতে দূরেও নয়। আবার খুব কাছেও নয়। নির্জন স্থানে দু'দণ্ড নিরিবিলিতে কাটানো বছরের কোন সুখপ্রদ অবসরে। নয়তো এদেব সময় কোথায়?...নবাবের অনুকম্পার পাত্ররাও মাঝে মাঝে এখানে পদার্পণ করে। চাতালে বন্দুক বাগিয়েও বসে। যদি শিকার নজরে আসে। রাজধানীর সীমা পার করলেই ঘনাবিষ্ট বনরাজি। দিনে গাঁয়ের লোক দল বেঁধে চলে এপথে। সন্ধ্যার পূর্বেই বনের পথ ত্যাগ করে সবাই। ভূপাল শহরের শেষ প্রান্তে বোশনপুরা নাকা, দিনান্তের পর কেউ এই বিন্দু অতিক্রম করে না।

উনবিংশ শতকের শেষে বারাদরির পত্তন। এর বিশেষ কোন ইতিহাস নেই। কিন্তু ভূপালবাসীরা তবু ভদ্‌ভদায় আসে। গোটের জন্য। মানে চড়ুইভাতি করতে। পিকনিকের আনন্দ পেতে। হঠাৎ বর্ষায় অথবা প্রয়োজনে এই দালানে আশ্রয় নেয়, রক্ষকের অনুমতি নিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতে। ...কখন আনন্দ আসরও জমে। পানপাত্র বিনা রাতের আসর জমে।... সারঙ্গিতে মধুর তান ধরে। তবলার লহরা চলে। তা ধিন ধিন।···নূপুরের নিক্কন ধ্বনি···ঝম্ ঝম্। প্রাণ চঞ্চল হয়। সুরমা টানা চোখে বাইজী নিতম্বে ঢেউ তোলে। কোমর বিছে চমকে ওঠে গ্যাস বাতির বাহারে। নর্তকীর বেণীতে জুঁই ফুলের মালা, সাপের মত পাক খায়। নূপুর বেজে চলে। আঁখিতে মোহনী জাদু। মায়াজাল।···দেওয়ালে বিবিধ চিত্রকলার রূপ।...এরা ইতিহাস। ...মূক। কথা বলে না। কিন্তু অতীতের মুকুর। এক তরুণ কবি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে ঐ দিকে। নর্তকীর বদলে, দেওয়ালের এক তৈল চিত্রেব দিকে। রায়সেন দুর্গের চিত্র।...আর অন্য চিত্রে, বর্তমান ভূপালের স্থপতিকার, প্রথম পুরুষ...দোস্ত মহম্মদ খানের প্রতিকৃতি—যেন দম্ভের প্রতিমূর্তি। কিংখাপে তরবারি। শক্তির প্রতীক।

২

দোস্ত মহম্মদ। সতর দশকের শেষে সুদূর কাবুল হতে ভারতে আসেন। দিল্লীর বাদশাহর দরবারের পাশে ঘুরে, কোন সুরাহা হয় না। ভাগ্যান্বেষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাঠান সীতামোর রাজার কাছে ঠাঁই পান। সে আস্তানাও ত্যাগ করেন। উচ্চাশা মনের কোনে অনবরত ধাক্কা মারতে থাকে। হাত কচলান, কোথায় থাবা মারা যায়। ভাগ্যের গতি ঘোরাতেই হবে।

এরপর, মঙ্গলগড়ের ঠাকুর আনন্দ সিংহ সোলাংকির অধীনে আশ্রয় পান। মাত্র পঞ্চাশ ঘোড়সওয়ারই ওঁর বল। হঠাৎ ঠাকুরের দেহাবসান হয়। ওঁর শাপে বর হয়। বিশেষ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আনন্দ সিংহ উত্তর ভারতে যান। মা চান্দেলজীকে জায়গীরের ভার দিয়ে যান। দোস্ত মহম্মদ ওকে সহায়তা কববেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! পরবাসেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আনন্দ সিংহ। বৃদ্ধা মা চান্দেলজী পুত্র শোক সহ্য করতে পারেন না। উনিও ইহলোক ত্যাগ করেন। দোস্ত মহম্মদের সোনায় সোহাগা। জায়গীরদারীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঠাকুরের সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করে দোস্ত মহম্মদ কেটে পড়েন।

বেরাসিয়ায় এসে উপস্থিত হন দোস্ত মহম্মদ। দিল্লীর গদীর এক বংশধব তাজ মহম্মদকে বশীভূত করেন। পথ প্রশস্থ হয়। প্রস্তাব দেন—ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বেরাসিয়া পরগণা হস্তান্তর করতে।

তাজ মহম্মদ জিজ্ঞাসা করেন—এত অর্থ কোথায় পাবে? আমি কিন্তু নগদে চাই, তবেই এই পরগণা পাবে।

হঠাৎ বারান্দার কোণে টিকটিকি টিক টিক করে ওঠে। দোস্ত মহম্মদ কি একটু কেঁপে ওঠেন? না, সামলে যান। বিনয়ের অবতার হয়ে উত্তর দেয়—হুজুব, ঠাকুর আনন্দ সিংহের কাছ থেকে কিছু অর্থ পেয়েছি। এই নিন। বলে, টাকার তোড়া রাখেন।

এরপর দোস্ত মহম্মদ আর পিছনে তাকাননি। ওঁর নজর পড়ে আরও সমৃদ্ধ এলাকার দিকে। স্থিতি মজবুত করতে হবে।

জগদীশপুরের রাজপুত জায়গীরদার কি ওঁর প্রতিবন্ধক? উনি ছোট কেল্লায় নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। কি করা যায়? ভাবেন দোস্ত মহম্মদ। প্রেমে আর সমরে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। প্রয়োজনে চাতুর্য্যের আশ্রয় নিতে হবে। মন সজাগ হয়। পথ খোঁজেন। জায়গীরদারের দিকে দোস্তির হাত বাড়ান। দোস্তি জমে...মাইফেলের আমন্ত্রণ যায়।

দোলের দিন। বসে আনন্দ আসর। শিকারের নাম করে, দোস্ত মহম্মদ তাঁবু ফেলেন। নর্তকী বিলম্বিত লয়ে, সারেঙ্গীর তানের সাথে, দুলে দুলে, বাঁকা চাঁদের মত আকর্ষক রূপকে, জায়গীরদারের সামনে তুলে ধরে।

...সাঁইয়া বিনা ঘর সুনা, সুনা...বাইজীর মধুর তানে, ওর নমনীয় অধরের দিকে তাকাতে, জায়গীরদারের পানপাত্র ছলকিয়ে ওঠে। হলুদ গালিচা একটু ফিকে হয়। কিন্তু না, একটু পরেই লালবর্ণ ধারণ করে।

দোস্ত মহম্মদের চোখ জ্বলে ওঠে। শরাবেব প্রতিক্রিয়ায় নয়, হিংসায়।... হঠাৎ তাঁবুর দড়ি কেটে ফেলা হয়। আমন্ত্রিত মেহমানদের হত্যা করা হয়। ...হট্টগোল...বাইজীর আসর ভেঙ্গে যায়। খুশি হয়ে ওকে পুরস্কৃত করে দোস্ত মহম্মদ। ও খুব ভেলকী দেখিয়েছে।...সব মৃত দেহকে গড়ের পাশে তাহল নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। হলাল করে, নদীতে ফেলায় এর নূতন নাম হয় হলালী।

শ্যাওড়া গাছে, প্যাঁচাটা ভয় পায় জায়গীরদারের কাতর বুক ফাটা চিৎকারে। কক্ কক্ আওয়াজ করে উড়ে যায়। জায়গীরদার ক্রমে চোখ বুজতে থাকে। হঠাৎ একবার চোখ বিস্ফারিত হয়। হাত মুষ্টি বদ্ধ হয় আক্রোশে···বিফলতায়।

বুদ্ধের বাণী বিধৌত বিদিশা, সাঁচী ও বুধনী অচিরেই দোস্ত মহম্মদের মুঠিতে আসে।...বিদিশার শাসক ফারুককেও হারিয়ে দেন। আসলে ফারুক, দোস্ত মহম্মদকে পরাস্ত করেন। উল্লাসিত ফারুক যখন সৈন্যদের নিয়ে ফিরছিলেন, অন্ধকারে হাতির লেজ ধরে উপরে ওঠে যান দোস্ত মহম্মদ, নিমেষের মধ্যে ফারুকের গলা কেটে ফেলেন। দুর্গে ঢুকে লাশ হাতির উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়। ভীত, আতঙ্কিত সৈন্যরা শেষে দোস্ত মহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে। বিদিশার পাশে সাঁচীর রাজপুত শাসক আগেই পরাস্ত হয়েছেন। এবার দিল্লীর মোগল বাদশাহ ফারুক শিয়ারকে উপঢৌকন পাঠান দোস্ত মহম্মদ। দিল্লী দরবার খুশি হয়ে ফরমান জারি করে। ওঁকে খান উপাধী প্রদান করে।

দোস্ত মহম্মদ ক্রমে সিহোর, ইছাবর এলাকার অধিপতি হয়ে বসেন। আমিলকে পরাস্ত করে আস্টা দুর্গ হস্তগত করেন। নদীর তীরে, রমণীয় স্থানে, উচ্চে কেল্লা বানান। সন্ধ্যার বাতাসে জাদুর খেলা। খুশি উপছে পড়ে দোস্ত মহম্মদ খানের চোখে। নর্তকী সেলাম করে নূতন শাসককে।

জগদীশপুরেই রাজধানী স্থাপনা করেন দোস্ত মহম্মদ। গড় বানানো হয়। নাম পরিবর্তন হয় ইসলামনগর রূপে। ভবিষ্যতে, ভূপালের দ্বিতীয় রাজধানীর

কাজ করে। ছল, বল, কৌশল-সবই অবলম্বন করে চলেছেন দোস্ত মহম্মদ নিজ পথ পরিষ্কার করতে।

সাচীর অদূরেই দুর্ভেদ্য রায়সেন দুর্গ দাঁড়িয়ে। দিল্লীর বাদশাহর আধিপত্যে এই কেল্লা। এর ভিতরে মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসে। খোদার আশীর্বাদ চাইছে। মসজিদটিকে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এটা একদা হিন্দুর মন্দির ছিল। কালের ক্রুর গতিতে, একে নব সাজে পরিবর্তিত করা হয়েছে। অন্তরে ভগবানই খোদা। আরাধনাই সাধনা। ভক্তি নিবেদন করাই উদ্দেশ্য। লক্ষ্য সবারই এক। পথ আলাদা মাত্র—লোকে এরকমই ভাবে।

দুর্গের প্রাচীরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন দোস্ত মহম্মদ। তামাটে আকাশ। সূর্য অস্তাচলে। গভীর ভাবে তাকান, চিন্তা করেন কিছু, নূতন পরিকল্পনা জাগে মনে।

কিছু দূরেই বেতবা নদী। পনর ক্রোশ দূরে ভোজপাল। না, ভোপাল। গোণ্ড রাণী কমলাপতির মহল দাঁড়িয়ে—বিশাল সরোবরের তীরে। এখান হতেই ভূপাল পরগণার শাসন চালনা কবেন রাণী। মাঝে মাঝে গিন্নোর কেল্লা থেকেও। রাজ্যকে ঘিরে রেখেছে প্রকৃতির অসীম দানে সমৃদ্ধ বনরাজি। এর মাঝেই সগর্বে অবস্থিতি ঘোষণা করছে কেল্লা গিন্নোর। বহুদূর থেকে নজরে পড়ে সুউচ্চ মিনারের ছোট গহ্বর। প্রহরী মোতায়েন। সজাগ দৃষ্টি—দূরে···শত্রুর গতিবিধির উপর।

ভূপালের সন্নিকটে ভোজপুর। শিবভক্ত পরমার রাজা ভোজ দশম দশকে, এখানে বেতবা নদীর উপর বাঁধ বাঁধেন। বিশাল জলাধার সৃষ্ট হয়। জল নিকাশেরও অপূর্ব পরিকল্পনা করেন। রাজা ভোজ চর্মরোগে ভুগতেন। রাজবৈদ্যর উপদেশে নদীর সঙ্গমে অবগাহন করতেন রাজা।

বেতবার তীরে মন্দির স্থাপন করেন। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।···বিশাল লিঙ্গ। মার্বেল প্রস্তরে তৈরী। লিঙ্গের বিশালতা অতুলনীয়। বোধ হয় মানুষের কল্পনা বহির্ভূত। তবু বাস্তবে রূপায়িত। রাজার মনস্কামনা কালের গর্ভে ডুবে গেছে। শুধু গর্ভগৃহ আজ দাঁড়িয়ে। পরিক্রমার সাক্ষী। কি ছিল ভোজের মনের গভীরে? পুণ্য সলিলা বেতবা গর্বিত শিব লিঙ্গের অবস্থিতিতে, বাকি তো মহাকালই জানে।···রাজা, প্রজা—সবাই ভোজপুরে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শত শত বছর ধরে।

শিবরাত্রিতে নিঃস্তব্ধ ভোজপুর গমগম করে ওঠে। বিরাট মেলা। লোকে লোকারণ্য। দোস্ত মহম্মদ এই লোক-সমাবেশকেই কাজে লাগাতে চান।···

কিন্তু এরা যে কমলাপতির অনুকম্পায় পালিত।...ওরা প্রজা। মনের গভীরে নূতন করে পরিকল্পনা জাগে দোস্ত মহম্মদের, কি করা যায়? ভূপাল যে ওর চাইই-চাই। হোলই-বা নগণ্য জায়গা তবু এ যে অমূল্য। সময় জলধারার মত বয়ে যায় হু হু করে। তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে। ভূপালের অবস্থান মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরিকল্পনার জাল বোনেন। ভূপালকে করায়াত্ব কবতে হবেই।

৩

রায়সেন দুর্গ। আকাশচুম্বি পর্বতে অবস্থিত। অবস্থানই এর রক্ষা কবচ। কিন্তু ভূপাল, কৃত্রিম নদী সংগমে দাঁড়িয়ে আছে—যেখান থেকে দুঃসাহসীক অভিযান-কারীদের মুখোমুখী জবাব দেবার আর সহজ পন্থা কিছু নেই। মালব থেকে উত্তরমুখী রাস্তা এসে, ভূপালকে অতিক্রম করেছে। ভারতের মধ্যবর্তী স্থান ভূপাল, মধ্যমণি।

তাই তো রাজা ভোজ চিন্তিত হন। যদিও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত না করার মত কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কেউ ওৎপেতে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পারে বৈকি! আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয়েছে যখন থেকে ছেদী রাজা কলচুরী গঙ্গদেওকে শায়েস্তা করেন। চান্দেলা, চালুক্য রাজার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। তখন থেকেই রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা, সুরক্ষাব কথা অহরহ অস্থির করছে তাঁকে। মালবের রাজধানী, 'ধারওয়ার' হতে, বহু শত যোজন দূরে ভূপাল। তাই রাজা ভোজ, রাজ্য সীমার শেষ প্রান্তে, বেপরোয়া পাহাড়ী নদীকে বাগে আনার কথা ভাবেন। ভোজপুরের শিব মন্দির এখান হতে মাত্র দশ ক্রোশ।

মন্ত্রী কল্যাণ সিংহকে ডাকেন রাজা ভোজ। মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

—মন্ত্রী, আমার ইচ্ছা রাজ্যর পূর্ব প্রান্তে, ভূপালে এমন কিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন যাতে অন্ততঃ এক দিক হতে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আর ভোজপুরে গিয়ে দেবাদিবের চরণে ফুলও দিতে পারবো। বেতবায় অবগাহন করে স্বাস্থ্য উদ্ধারও হবে।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ। আমি শীঘ্রই এ কাজে ব্রতী হবো। কিন্তু—

রাজা ভোজ একটু কপাল কুঞ্চিত করেন। সর্বদা প্রজার মঙ্গল কামনায় ওঁর মন ব্যাকুল থাকে। কাজেই মন্ত্রীর সাথে তর্কের অবতারণার বদলে, সুরাহা চান।

—কিন্তু আবার কেন! যা' অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, বিনা দ্বিধায় করবেন। এই আমার আদেশ—

—কিন্তু মহারাজ, এই কার্য্য করতে গেলে, আমায় অন্ততঃ বেশ কিছু দিন ওখানে থাকতে হবে।

—আচ্ছা, এই কথা!

কল্যাণ সিংহ এবার সানন্দে মাথা নাড়েন। রাজা ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন।

—বেশতো থাকবেন। এখানের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। জীবন তো কর্মের জন্য—সুখ দুঃখ সাথে চলে। ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

মন্ত্রী আর কালক্ষেপ না করে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সশস্ত্র সহচর নিয়ে রাজধানী হতে রওনা হন। নিবিড় জঙ্গলাবৃত পথ। পক্ষকাল পরে, ভূপালের কোল বেয়ে যে নদী বয়ে যাচ্ছে, তার পাশে ছাউনী পাতেন।

সহচরদের নিয়ে বন জঙ্গল আর পাহাড়ের পাদদেশে সরেজমিন পরীক্ষা কার্য্য চালান। কিছুদিন খুব পরিশ্রম করেন। এই নদীতে আরও কয়েকটি ছোট জল-স্রোত উত্তর দিক হতে এসে মিলিত হয়েছে। এবার ভবিষ্যতের কাজের রূপরেখা তৈরী করেন। দক্ষিণ বরাবর, পূবের কোণা ঘেঁসে, একটু জল নিকাশের স্থান ছেড়ে, বাকি জায়গায় বাঁধ দিতে হবে। যথা চিন্তা, তথা কাজ।

রাজার চিন্তা। রূপ দিতে দেরী হয় না। দূর-দূরান্তর হতে লোক আসতে শুরু হয়। নগণ্য নির্জন স্থান কোলাহল-মুখরিত হতে সময় লাগে না। চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

বাঁধ তৈরার কাজ শুরু হয়। মাটি কাটা হয়। পাথর ভেঙ্গে করা হয় স্তূপাকার। মাটির সাথে পাথর মিলিয়ে উঁচু পাড় বাঁধার কাজ চলে। শত শত মজুর-মিস্ত্রীর চিৎকারে নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গ্রাম চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিন যায়, মাস অতিক্রান্ত হয়। ধীরে ধীরে বাঁধের পাড় আরও আরও উঁচু হতে থাকে। এক সময় বাঁধের কাজ শেষ হয়। বাঁধের নিচে সুড়ঙ্গ পথে, বিশাল কৃত্রিম জলাশয়ের বাড়তি জল বের করার ব্যবস্থা আছে। কল কল শব্দে জল ধেয়ে আসছে ঢালের দিকে।

মন্ত্রী কল্যাণ সিংহের মুখে হাসি ফোটে। পরিশ্রম সার্থক। আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু। হালকা মেঘই কালো রূপ ধরবে। কালিদাসের মেঘদূত স্বরূপে ধরা দেবে এবার। ঝম্ ঝম্ করে বর্ষা নামবে। ভূপালের হ্রদ ফুলে উঠবে। এর গভীর বক্ষে ঢেউ নাচবে ভাদ্রে। বিশাল জলভাণ্ডার তৈরী হবে। উত্তর-পূর্ব দিকে গড় বানাতে হবে। সৈন্য থাকবে, অতন্দ্র প্রহরী পাহারা দেবে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য।

ভারত উৎসব-প্রধান দেশ। উপলক্ষ একটা চাই। বিশাল বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ। দেবতার নামে উৎসর্গ হয় বাঁধ। কল্যাণ সিংহ এই শুভ লগ্নে পূজা দেন। রাজ্যর মঙ্গল কামনা করেন মঙ্গলময়ের কাছে।···অজানা নদীর নাম হয় কল্যাণ স্রোত। কল্যাণ সিংহর নামে।···কালক্রমে জনগণ কল্যাণ স্রোতকে কালিয়া স্রোতে পরিণত করে।

এবার মন্ত্রী রাজধানী ধারওয়ার ফিরে যেতে উৎযোগী হন। তার পূর্বে সব ব্যবস্থা পূর্ণ করেন।···ভূপাল, সুরক্ষার দ্বার। একটি টোল স্থাপনা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য ভোজপুরে মন্দিরের জন্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পাঠানো।

রাজা ভোজ গুণী ব্যক্তি—জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, গণিত শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেছেন। বিদ্যাদান করতে তৎপর হন। রাজধানীতে, বিশাল বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতী ভবন, সরস্বতী মূর্তি স্থাপিত হয়। এই ভবন স্থাপত্য শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কারুকার্য্যখচিত, প্রশস্ত অঙ্গন। বড় বড় স্তম্ভ ভবনের শোভা বাড়িয়েছে।

—মন্ত্রী, আমি চাই রাজধানীতে কোন নিরক্ষর প্রজা বাস করবে না। সেইমত ঘোষণাপত্র জারি করুন। নিরক্ষর প্রজা শত্রুর সমান। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিন। যে প্রজা অক্ষর জ্ঞান অর্জন না করবে, তাকে রাজধানীতে বাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

ভারতী ভবনের খ্যাতি মালববাসীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাজা ভোজ জ্ঞানবর্তিকা তুলে ধরেন। জ্ঞান লাভের জন্য চতুর্দিক হতে লোক আসে। রাজধানীর প্রজাদের তো কথাই নেই। ওদের জন্য জ্ঞানলাভ আবশ্যিক।

রাজধানীতে, বর্দ্ধিত জনপদের দিকে লক্ষ্য রেখে, সুন্দর রাস্তা তৈরী হয়। প্রশস্ত প্রত্যেকটি পথ, চৌরাস্তায় গিয়ে মিলেছে। সুদৃশ্য বাগিচা স্থানে স্থানে সবুজের পাখনা মেলে ধরেছে। পয়ঃপ্রণালীর নব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ধর্মশালার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। রাজার গুণকীর্ত্তনে মুখর সারা মালব।

কর্মবীর রাজা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ধাক্কা খান। পূর্ব অপমানের বদলা নেবার জন্য, রাজা গঙ্গদেও, চালুক্য রাজা ভীমের সঙ্গে মিলিতভাবে মালব আক্রমণ করে। রাজধানীতে চলে 'লুটপাট। সাধের রাজধানীর লণ্ডভণ্ডের দৃশ্যে ভেঙে পড়েন। যুদ্ধেই বীর রাজা ভোজের মৃত্যু হয়।

৪

রাজা ভোজের গর্বের স্থান ভূপালকে রাণী শালমালী আরও উন্নত করেন কয়েক শত বর্ষ পরে। বিদ্যাদানের জন্যে সভা মণ্ডল নামে কল্পগৃহ স্থাপনা করেন তিনি, ঠিক রাজা ভোজের দুর্গের পাশে। কয়েক শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। আবার ভূপালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিশাল সরোবরের তীরে বেদের গম্ভীর বাণী মন্ত্রিত হয়।

...অসতো মা সদ্‌গময়ো—

...তমসো মা জ্যোতির্গময়ো

মন্দিরে পূজা এবং চার বেদ, ষট্‌ শাস্ত্র ও আঠারো পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা করেন রাণী। জ্ঞান বিতরণই নয় শুধু, ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করার প্রচেষ্টাও চলে।

কিন্তু ভবিষ্যত কেউ দেখতে পায় না। রাজা ভোজ অথবা রাজা বিদ্যাদত্তের পত্নী শালমালী কি চিন্তা করতে পেরেছিলেন? তাঁদের অতি সাধের তৈরী ক্ষুদ্র ভূপাল এই প্রথম লুন্ঠিত হ'ল।...ইতিহাসের পাতায় স্থান হয় ভূপালের।... তমসা ঘিরে ধরে...জ্যোতি নিভে যায়।...আল্লা-হো-আকবর—জিহাদের হুংকার তুলে সুলতান ইলতুতমিস আক্রমণ করে। মালব অধিকার করে।

উত্তর ও মধ্য ভারতের বহু শিল্পকলা ধুলিসাৎ হয়। প্রচুর সৌধ, অট্টালিকা ধ্বংস হয়। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মহাকাল মন্দিরও আক্রমণের হাত হতে রেহাই পায় না।

ভূপালের দুর্গ ভেঙ্গে পড়ে। জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। রক্ষা পেয়ে যায় বিশাল সরোবরের তীরে নগন্য একটি গ্রাম মাত্র। এরপর শুধু গ্রামের বৃদ্ধেরা প্রদীপ জালিয়ে কোনমতে ভূপালের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। বাকি সব মৃত। ধ্বংসস্তূপে শ্মশানের শান্তি নেমে আসে। পথে রায়সেন দুর্গও ওঁর কবলিত হয়।...এর আশী বছর পরে আলাউদ্দীন খিলজীর কবলিত হয় এই সুরম্য দুর্গ। উনিও ধ্বংসের ধ্বজা উড়িয়ে দেন। কারুকার্য্যময় কোন মন্দিরই রেহাই পায় নি ওঁর মুষলাঘাত থেকে।

পরের কয়েক শত বছর ভূপালের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে হাত বদল হয়। গোণ্ড রাজার অধিকারে আসে।

রায়সেন দুর্গেও নূতন শাসকের অভ্যুদয় হয়। ইনি হলেন শিলাহাদী। তোমর শাসক রাজত। খিলজী সুলতানেরা সাম্রাজ্যের ভাঙন রোধ করতে

পারলো না। রাজপুত প্রধান মেদিনী রায়ের সঙ্গে বিবাদ দেখা দিল। সুলতান, গুজরাটের নবাবের সহায়তা চান। মেদিনী রায় মেবারের রানা সংগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যুদ্ধে সুলতান পরাজিত হয়ে বন্দী হন। মেদিনী রায় মাণ্ডু অধিকার করে। রাজ্যের বাকি অংশেও রানাব আধিপত্য স্থাপিত হয়।

রায়সেন, বিদিশাতে শিলাহাদীর প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়। মেবারের রানা রায়সেন দুর্গ অধিকার করেন। শিলাহাদী রানার খুব নিকটে আসেন। রানা ওঁর শৌর্যে মুগ্ধ হন। নিজ কন্যা দুর্গাবতীর সঙ্গে বিবাহ দেন। মালবের এক অংশকে সুদৃঢ় করেন।

এবার হিন্দুস্থানে নূতন শক্তির অভ্যুদয় হয়। মোগল। বাবর ভারত আক্রমণ করেন। পানিপথে ইব্রাহিম লোদীব সাথে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও রণনীতির জোরে, বাবর জয়ী হন। দিল্লি'র মসনদ হাতে আসে।...আসে আগ্রাও। অমূল্য কোহিনূর মণির চমকে বাবরেব চোখ ঝলসে যায়। উপঢৌকন পান। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী নিজেও জীবন দেন।

রানা সংগ দূর থেকে সব দেখছিলেন। ভেবেছিলেন অন্যদের মত বাবরও লুটপাট করে চলে যাবে। তা' যখন হল না, তখন রানা সংগও কোমব বাঁধেন। অন্য রাজপুত ও পাঠানদের একত্রিত করে, বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে, আগ্রাব দিকে ধাবিত হন। শিলাহাদীও ওঁর সৈন্য সামান্ত নিয়ে বানাব সহায়তা কবার জন্য এগিয়ে আসেন। আগ্রার নিকট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।...বিজয় বাবরেরই প্রাপ্য হয়। মান রক্ষার জন্য গোণ্ডয়ানাব শাসকের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু রানা সংগকে মাথা নিচু করতে হয়। প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়। মনঃক্ষুণ্ন রানা এরপব মাত্র কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। অসমসাহসী রানা সংগের হিন্দু রাজ্য স্থাপনার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সারা জীবন সংগ্রাম করে তাঁর একটি হাত ও একটি চোখ নষ্ট হয়। তবু বাবরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পিছু পা হন না এই অসাধারণ সাহসী বীর। ওঁর মৃত্যুর পর গুজরাতের বাদশাহ মালবের দিকে আবার অভিযান শুরু করেন।

কবির ভাষায় রায়সেন দুর্গের অবস্থান যেন মর্তে স্বর্গের অধিষ্ঠান। দাস, লোদী, মোগল আর হিন্দু শাসকরা একে কব্জা করেছেন। প্রত্যেকেই এই রমণীয় দুর্গের পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করেছেন। পাহাড়ের মাথায় কয়েকটি পুষ্করণী। প্রচুর সংখ্যক কুঁয়া। সুদৃশ্য মহল। কয়েকটি ঝোলানো বারান্দা। যতদূর দৃষ্টি যায়, মনোরম-নয়নাভিরাম ছবি।

শিলাহাদী কর্মে বিশ্বাসী পুরুষ। ভূপালের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মালব-

আক্রমণ করেন। কিছু সফলতাও পান। গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ কূটনীতির চাল চালেন। শিলাহাদীকে বশে এনে উজ্জয়িনী পরগণা ও বিদিশা ওঁকে জায়গীর হিসাবে দেন—বোধ হয় একটু সময় নেবার জন্য।

এক শাসক অন্য এক শাসককে কখনও শক্তিশালী দেখতে পাবে না। শিলাহাদী ক্রমশঃ নিজের স্থিতি মজবুত করেন। ওঁকে প্রতাপশালী হতে দেখে, বাহাদুর শাহ ওঁর নামে বদনাম রটায়। পত্র লেখেন। পত্র নয়, যেন বল্লমের খোঁচা।

...তুমি নিজের হারেমে চার রকমের নর্তকী রেখেছো। সুন্দরী মুসলমান নারীও আছে। তাদের সুদূর সিন্ধুদেশ থেকে আনা হয়েছে। দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীনের বিধবা পত্নীকেও অঙ্কশায়িনী করেছো। এই জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ তলব করতে হচ্ছে।

শিলাহাদীর এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না। ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে সুলতান। ওঁকে বাহাদুর শাহ শান্তিতে দিন কাটাতে দেবে না। তাই অজুহাত খোঁজা বাহাদুর শাহের কি হারেম নেই? কিন্তু তাতে কোন দোষ নেই! সেখানে কি হিন্দু নর্তকী নেই? তাতে কি? কিন্তু শিলাহাদীর ছিদ্র অন্বেষণ করা চলছে।

বাহাদুর শাহ কালক্ষেপ না করে, গুজরাত হতে মালবে এসে হাজির হন। নিমেষে মাণ্ডু অধিকার করেন। দরবার বসে। সেনাপতি নাসু খানকে পাঠান রায়সেনে। শিলাহাদীকে আনতে।

নাসু খান বিরাট বাহিনী নিয়ে, রায়সেন দুর্গের পাদদেশে তাঁবু গাড়ে। শিলাহাদীর সঙ্গে বার্তা বিনিময় হয়।

—সুলতান জানতে চেয়েছেন, কেন আপনি হারেমে মুসলিম নর্তকী রেখেছেন। তাদের জন্য কারুকার্য্য করা পোষাক আমদানী করেছেন। সুলতান খুশি হয়ে আপনাকে অতিরিক্ত জায়গীর দিয়েছেন। মুসলিম নর্তকী মহলে রাখাকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সমান ভাবেন। মনে আঘাত পেয়েছেন।

শিলাহাদী একটু ভাবে, কি জবাব দেবে। কিছু নির্ণয় করে।

—সুলতান কি করে জানলেন এটা সত্য বলে? থাকগে। নর্তকীতো হারেমেই থাকে। আর মুসলিম হলে অন্যায় কি?

—তা' তো জানি না। তবে শাহেনশাহ আপনাকে মাণ্ডুর দরবারে তলব করেছেন। আর আমায় পাঠিয়েছেন নিয়ে যেতে।

শিলাহাদী বুঝলেন ছল করে লাভ হবে না। তাহলে সম্মুখ সমর অনিবার্য্য। লোকক্ষয়। উনি মাণ্ডু রওনা হন নিষ্কৃতির পথ বের করতে।

মাণ্ডুতে পৌছে, নাসু খান বাদশাহর কানে কুমন্ত্রণা দেয়।

—জাঁহাপনা, এরপর যদি শিলাহাদীকে ছেড়ে দেন, উনি মেবারের রানাদের সহায়তায় আপনাকে উত্যক্ত করতে পারে। রানাদের সাথে ওঁর আত্মীয়তা আছে।

—ঠিক। বাহাদুর শাহর চোখ জ্বলে ওঠে। নিমেষের মধ্যে কর্মপন্থা স্থির হয়।

শিলাহাদীকে আটক করা হয়। বন্দী বানায়। ওর সঙ্গে যে সৈন্যদল গিয়েছিল, তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ভাগিয়ে দেয় নাসু খান। হাতিগুলি দখলে আনে বাহাদুর শাহ। হাতিইতো সমরাঙ্গণে বিভীষিকা।

শিলাহাদীর অনুপস্থিতিতে, ওঁর অনুজ লক্ষণ সিং রায়সেন দুর্গের ভার নিজের হাতে তুলে নেন। দৃঢ় ভাবে লাগাম ধরেন। বাহাদুর শাহ বুঝলেন এই স্বর্ণ সুযোগ। শিলাহাদী বন্দী। রায়সেন দুর্গ অরক্ষিত। সেনাপতি ইমাদুল মালিককে তলব করে বাদশাহ।

—মালিকজী।

—জাঁহাপনা, হুকুম করুন।

—তোমায় একটি দুরূহ কাজে পাঠাচ্ছি। তুমিই এ কাজের পক্ষে উপযুক্ত। অবিলম্বে রায়সেনের পথে পাড়ি দাও। শিলাহাদীর ভাই দুর্গ অধিকার করে বসেছে। এই সুযোগ—ওকে শক্তিশালী হতে দেওয়া যায় না।

—জাঁহাপনার যেমন হুকুম—

মালিকজী বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ছুটলো। ভূপালের বিশাল জলাশয়ের পাশ দিয়ে তীর বেগে ধেয়ে চলে। কিন্তু লক্ষ্মণ সিং মুষিক নয়। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে মালিকজীর সৈন্যকে প্রতিরোধ করে। মালিকজীকে বেতবার পাশে জঙ্গলের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। দম নিচ্ছে দু'পক্ষ।

আকাশে মিট মিটি তারা। অল্প আলোর প্রকাশ। দুর্গের অলিন্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ সিং দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিছু দেখা যায় না। তবে বোঝা যায় মালিকজীর সৈন্যদল বন জঙ্গলের অন্তরালে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ বড় ভাই শিলাহাদীর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওর কি হ'ল, জানতেও পারে না। তারপর এই যুদ্ধ। মাথা ঝিম ঝিম করে।

মালিকজীও ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহর কাছে গোপনে সংবাদ পাঠান

বিফলতার। দুর্গ জয় করতে পারেননি। বাহাদুর শাহ নূতন চাল চালেন। বন্দী শিলাহাদীকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। পরে ওকে মুক্ত করে দিয়ে, রায়সেনে পাঠান। ওকে নির্দেশ দেন, যেন ছোট ভাইকে বলে, দুর্গের ভার সুলতানের অনুচরকে দিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শিলাহাদী রায়সেনে ফেরে। লক্ষ্মণ সিং ছুটে যায়। দাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। চোখ ভিজে ওঠে। মিলনের আনন্দাশ্রু। হঠাৎ মাথার দিকে নজর পড়ে। আঁতকে ওঠে লক্ষ্মণ সিং।

—এ কি, দাদা তোমার মাথায় ফেজ টুপি কেন?

শিলাহাদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। গ্রীষ্মকাল। উত্তপ্ত হাওয়া। ততোধিক উত্তপ্ত শিলাহাদীর হৃদয়। ভাই লক্ষ্মণ সিংকে ফের জড়িয়ে ধরেন।

—লক্ষ্মণ, আমি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছি। না, বাধ্য হয়েছি। আর তুইও সুলতানের বশ্যতা স্বীকার কর, এই দুর্গ ওকে সঁপে দে—

—না, দাদা। সে হয় না। বৌদির কথা একবার ভাবো। ও রানার কন্যা। বীর রাজবংশের মেয়ে। অগ্নিময়ী নারী। সে কি কখনও এমন প্রস্তাব স্বীকার করবে? না, প্রাণ থাকতে তোমার কথা মানবে না।

—তবে?

—শোন। রানার কাছে সংবাদ পাঠানো যাক সৈন্য দল পাঠাতে। সাহায্য করতে। বাহাদুর শাহর দাঁত ভেঙ্গে দেবো।

কিন্তু বাহাদুর শাহও বসে নেই। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে, কাল বিলম্ব না করে, নিজেই রওনা হয়েছেন রায়সেন অভিমুখে। দুর্গ ফতে করতে।

শিলাহাদীর পুত্র, বাহাদুর শাহর কাছে বন্ধক ছিল। ও বেরিয়ে পড়ে উজ্জয়িনীর পথে। বাবাকে বোঝাতে। বিবাদ হতে বিরত হতে। কিন্তু বাহাদুর শাহ নিজেও ওর পিছনে পিছনে এসে হাজির উজ্জয়িনীতে। শিলাহাদীর পুত্র ভূপত চিতোরে পালিয়ে যায়। বাহাদুর শাহ দ্রুত গতিতে এসে বিদিশা আক্রমণ করেন। লুণ্ঠন চালান। আঠারো বছর ধরে এই জনপদ শিলাহাদীর হাতে থাকার পর, হাত বদলায়। পরে রায়সেনে এসে উপস্থিত হন।

অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে রায়সেনের বনানী চমকে ওঠে। দারুণ সংঘর্ষ হয়। শিলাহাদীও বীর বিক্রমে লড়েন। ওঁর দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধে মারা যায়। শিলাহাদী বন্দী হন। ফের ওঁকে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করেন সুলতান। লক্ষ্মণ সিং কোনমতে পালিয়ে যান। দুর্গের ভিতর আশ্রয় নেন।

পরে অবশ্য লক্ষ্মণ সিং বাহাদুর শাহর কাছে সংবাদ পাঠান, যে উনি আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু বড় ভাই শিলাহাদীকে মুক্ত করতে হবে বন্দীশালা হতে। বাহাদুর শাহ চান কোন মতে লক্ষ্মণ সিংকে বাগে আনতে। ওঁর প্রস্তাবে রাজি হন। সেনাপতি আলি শের খানকে ডেকে পাঠান।

—জাঁহাপনা তলব করেছেন?

—হাঁ। তোমায় রায়সেন যেতে হবে। বন্দী শিলাউদ্দীনকেও নিয়ে যাবে। ও রায়সেন পৌছলে, ওঁর ছোট ভাই আত্মসমর্পণ করবে। ওদের নিরস্ত্র করবে। দুর্গের ভার নিজের হাতে নেবে।

ধুলো উড়িয়ে আলি শের রওনা হয়। যতবার ভূপালের উপর দিয়ে ফৌজ যায়, ততবার ভূপালের কিছু না কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তালাবের স্বচ্ছ জল ঘোলা হয়।

শিলাহাদী রায়সেন পৌছলেন। আত্মসমর্পণের চেয়ে আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করান ওঁকে লক্ষ্মণ সিং।

—দাদা, আজন্মের পরিচিত প্রিয় এই কেল্লা, বাহাদুর শাহর হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে তো মৃত্যু স্বরণ করাই শ্রেয়।

চিন্তাগ্রস্ত হন শিলাহাদী। নিস্তব্ধ রাত্রি একটা পাখি কাতর স্বরে ডেকে ওঠে। পুষ্করণীর তীরে দাঁড়িয়ে শিলাহাদী ভাবেন, কি করা যায়।

৫

অতীতের মধুর স্মৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে···সামনে স্ফটিক স্বচ্ছ সরোবর। তীরে শিলাহাদী দাঁড়িয়ে। আধো অন্ধকার। আকাশে তারার ভীড় স্বল্পালোক পুষ্করণীর জলে চাকচিক্যের জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে শিলাহাদী কেঁপে ওঠেন। হাত দিয়ে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে চান। বুকে হাত রাখেন, স্পন্দন পরীক্ষা করেন। হৃৎপিণ্ড দাপাদাপি করছে। বেঁচে আছেন তিনি। কিন্তু কি লাভ বেঁচে থেকে? ছোট ভাই লক্ষ্মণ সিং বলেছে এমন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

ওকি? একটা অজানা পাখি জলের উপর গোত্তা খেয়ে ফের উপরে ওঠে গেল। অস্পষ্ট শব্দ করে আধো অন্ধকারের বুকে। শিলাহাদী বুঝতে পারেন না। পাখির ভাষা কি বোঝা যায়? যায়ও কখন কখন। ময়না যখন মধুর সুরে অন্তঃপুরে খাঁচায় গেয়ে উঠতো, তখন তার মনের কথা বোঝা যেত। কিন্তু এ

পাখিতো বিকৃত আওয়াজ করে গেল—যেন বোবা-কান্না। মৃত লোকের আগমনী গান, যার সুর নেই। কেমন যেন অজানা লোকে যাবার ডাক শোনা যাচ্ছে। অথচ…

এই সরোবরের চতুর্দিকে আজও সতেজ মেহেদীর কুঞ্জে ঘেরা। কিছু জায়গা উজাড়। যুদ্ধের ধাক্কা এখানেও লেগেছে। কেবল জলরাশির উপর হাল্কা হাওয়ার দোলা, যা এখনও তুষিত হয়নি।

স্মৃতির পর্দা সরে যায়।…সেই কুহাকিণী রাত্রে, এই মেহেদীর ঘন পাতার অন্তরালে, শিলাহাদী প্রেমের উপবন সৃষ্টি করেছিলেন। না, কোন নর্তকীর কটিতট বেষ্টন করে নয়। তবে অভিসারে। চুপি চুপি। কিন্তু কার সাথে—

আজকের রাণী দুর্গাবতী…সেদিন নব বধূ রূপে এই কুঞ্জ বনে ধীর পদে পদার্পণ করেছিল। না, ও আসতে চায়নি। শিলাহাদীই ওকে ছাড়েননি। নাছোড়বান্দা। জোর করে এখানে এনেছিলেন। পাগলামীর চরম।

রাজপুতানী, বধূর বেশে অপরূপ সাজে সেজে, অলিন্দে দাঁড়িয়েছিল। সুঠাম তনু। রূপের বান ডেকেছে। হীরের নাকছবির দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। চাঁদের মায়াবী মায়াজাল। মহলের শিখর দেশে, হাল্কা পায়ে দুর্গাবতী হাঁটে। এক অলি, ১১ত অন্যত্র। পায়ে রূপোর মল ঝিম ঝিম সুর তোলে। নিঃশব্দ কক্ষে মধুর আওয়াজ।

শিলাহাদী রাজা। না চোর। না, চৌর্য্যবৃত্তির ক্ষণিক নেশায় মেতেছে। দূর হতে নিজের পরিণীতা স্ত্রীকে নিরিবিলিতে অবলোকন করে। পত্নীর অজান্তে, ওর রূপ সুধা পান করছে। রাজস্থান সুন্দরীর বসন্তের বাতাস ওর সর্বাঙ্গে।

অপরিচিত পরিবেশ। অচেনা রাত্রির মায়া। রায়সেন কেল্লার সিংহদ্বার বন্ধ হলো। ভেরী হতে নিনাদ ঘোষিত হয়। চারিদিক শান্ত। কেবল সোঁ সোঁ হাওয়ার শব্দ। সিংহদ্বারের মজবুত কাঠের বুকে এক হাত প্রমাণ লৌহশলাকা প্রোথিত। শত্রু যাতে হাতি দিয়েও ভাঙার দুঃসাহস না করে।

প্রাসাদের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে রাণী গবাক্ষ দিয়ে দূরে দেখতে থাকে। শ্বশুরালয়ে এসেছে। অপরিচিত স্থান। আর পতিও অজানা।

আজ মধুযামিনী। পালঙ্কে ফুলের মেলা। স্বামীর পরশ পাবে দুর্গাবতী। সোহাগের বন্যায় ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অধৈর্য্য নয়। অধীরও নয়। অজানা ভয়। দুরু দুরু করছে বুক। স্বামীর কথা ভাবে। কেমন সে। সেই পুরুষ যার কল্পনা প্রত্যেক কুমারী কন্যা শিশুকাল হতে করে থাকে।

সুসজ্জিত কক্ষের চতুর্দিকে বেল, গোলাপের মৃদু সুবাস। শিলাহাদী চুপি চুপি কক্ষের এক কোন হতে বের হয়ে এসে, নব বধূকে অলিন্দের পাশে সুদৃঢ় বাহু বন্ধনে বেঁধে ফেলে। দুর্গাবতী কিছু বলার আগেই, ওর কর্ণকুণ্ডলের পাশে মৃদু শব্দ করে.. আমি গো, আমি...এসেছি প্রিয়া ..

নব বধূ সরমে উন্মীলিত আঁখি বন্ধ করে। শিরায় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তন্ত্রীতে জাগে স্পন্দন।

বহু দূরে, সিংহদ্বার হতে ভেসে আসে সানাইয়ের মধুর তান। শিলাহাদী নব বধুকে সবল বাহুর মাঝে তুলে নেয়। বধূ আবেগে কাঁপে। শিলাহাদী, দুর্গাবতীর উদ্দাম কেশগুচ্ছর মাঝে অধর অন্বেষণ করে।...শিলাহাদী কিন্তু ওকে শয্যার দিকে নয়, নিয়ে যায় দূরে, যেখানে নব বধূ, একটু আগে গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছিল সরোবরের দিকে।

—রাণী, ওদিকে তুমি কি দেখছিলে। বলো—

দুর্গাবতী সবল বাহুর পাশে আবদ্ধ—পুরুষের প্রথম স্পর্শ। বুক কাঁপছে। মাথা ঝিম ঝিম করে। রক্তে উন্মাদনা, ভয়ে, উত্তেজনায় বুকের ভিতর তোলপাড় করে। ঘাম বেনারসী শাড়িতে আলপনা আঁকে। পতির কথার কি জবাব দেবে? আড়ষ্ঠতা ঘিরে ধরেছে। জিহ্বা বিরস। যৌবনের জোয়ারে ভরা দেহ। স্বামীর হাতের মাঝে আকুলি বিকুলি করতে থাকে। শিলাহাদী হাতের চাপ বৃদ্ধি করে। শিলাহাদী বুঝতে পারে, বধূর কথা না বলার কারণ। নূতন ও এই বাদল মহলের ভিতর। আজ ওর আত্মসমর্পণের প্রথম রাত্রি। হৃদয় দেবার। সর্বস্ব দেবার।

—আমি জানি তুমি কি দেখছিলে। ঐ দূরের সরোবর সাগরতাল। চলো। আরও সরোবর আছে। ওখানে চলি আমরা। মুক্ত আকাশের নিচে। স্বপ্নের রাজ্যে। সাঁচীর মত স্তব্ধতা। কেবল তুমি আর আমি। মিলন যামিনীর আসর বসবে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে।

দুর্গাবতী কিছু বলতে পারে না। শিলাহাদীর ক্ষুধার্ত মুখ নেমে আসে ওর গলার পাশে। দুর্গাবতী থর থর করে কেঁপে ওঠে। এ কি! ওর পতি আজকের মায়াময় রাত্রির বাসর বসাবে গৃহের বাইরে!

শিলাহাদী মহল হতে বের হয়ে আসে। গুপ্ত পথ ধরে। সজাগ প্রহরী দ্বার ছেড়ে দেয়। তীক্ষ্ণ বল্লম সরিয়ে নেয়। চোখে বিস্ময়! এ কি? আজ,রুদ্ধ কক্ষ ছেড়ে, রাজা নব পরিণীতাকে নিয়ে চলেছে প্রসাদের বাইরে। কোথায়? কে জানে?

কেল্লার অধিবাসীরা দিনের ভূরি ভোজের পর পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। সবাই জানে আজ ফুলশয্যার রাতের চঞ্চল মনের কথা, দুটি অজানা হৃদয়ের মিলনের কথা। আর রাজা কি না ঘর ছেড়ে বাইরে!

প্রহরীর কাজ পাহারা দেওয়া। দুর্গের অভ্যন্তরে ভয়ের কিছু নেই। প্রতি ফটকে প্রহরী মোতায়েন। চুপিসাড়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বিশ্বাস-ঘাতকের শাস্তি চরম। গর্দান যাবে। সবাই জানে!

প্রাসাদ পিছনে ফেলে বধূকে নিয়ে শিলাহাদী এগোতে থাকে। হৃদয়ে চঞ্চলতা। দুর্গের বহু দূর পর্যন্ত চোখের বন্ধনীতে আটকা পড়ে। হাল্কা চাঁদনীর খেলায় আলোর অস্পষ্ট রেশ চোখের পর্দাকে নাড়া দেয়। ছোট ছোট পাথর সাজানো থরে থরে। সৈন্যদের থাকার আস্তানা। পাথরের ফোকর দিয়ে আলোর ঝলক বের হচ্ছে।

ভোঁ ভোঁ। কোথা থেকে একটা উটকো কুকুর তেড়ে আসে। শিলাহাদী মুখ থেকে একটু শব্দ করে—শী শী। অবিশ্বাস্য। তাতেই কুকুরটা চুপ করে। রাজাকে চেনে নাকি কুকুরটা!

দুর্গাবতী পলক না ফেলা বিস্ময় নিয়ে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে শিলাহাদীর দিকে তাকায়। পরে কুকুরের দিকেও। শিলাহাদী যেন পত্নীর বিস্ময়কে অনুমান করে। একেবারে বুকের কাছে টেনে, বলে—রাণী, আমি রাজা। সবার পরিচিত। তাইতো ও চুপ করে গেছে আমার গলার স্বর শুনে।

দুর্গাবতী একটু ফিক করে হেসে ফেলে, শিলাহাদীর কথায়। কুকুরটা চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করে। শিলাহাদী বাঁ হাতের বাঁধন একটু আলগা করে। যেন কুকুরের অচেনা দৃষ্টিকে সহজ করতে পারে না। কুকুরটা ধীরে ধীরে লেজ নেড়ে, এবার ওদের পিছনে চলতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে, ফের অন্য দিশায় চলে যায়।

এবার সরোবরের সন্নিকটে এসে দাঁড়ায় শিলাহাদী। পাশে রাণী। হঠাৎ কোথাও খস্ খস্ শব্দ হয়। চকিতে শিলাহাদী তলোয়ারের কিংখাপে হাত দেয়। কোন শত্রু নয় তো! ওদের দূর হতে আসতে দেখে, পিছু নিয়েছে! না, ভয়ের কিছু নেই। ছোট একটা ঝোপের পাশ হতে এক জোড়া খরগোশ বের হয়। নীল লোহিত চোখে দুনিয়ার তামাম বিস্ময়। দুটো পা তুলে, মুখটা আঁচড়ায়। রাজারাণীকে মোটেই তোয়াক্কা করে না। শিলাহাদীরা অনাহুত। কেন এ সময়ে এখানে এসেছে?

রাণীকে নিয়ে কোথায় বসবে ? একটু চিন্তা করে। আকাশের দিকে তাকায়। হালকা আলোর পরশ সর্বত্র। দুর্গাবতীর মুখে ঘোমটা। যদি ঘরের ভিতর থাকতো তাহলে প্রদীপের আলোর আভা পড়তো দুর্গাবতীর মুখে—সৌন্দর্যের ভাণ্ডারে। চোখে চোখ রাখতো। কিন্তু এখানে বিশাল আকাশের নীচে আসর – স্বল্পালোকে মায়াপুরী।

শিলাহাদী এখন নিজেকে বোকা মনে করে। কেন নব বধূকে শুভ মিলনের দিন এমন নির্জন স্থানে নিয়ে এলো। বরং ওকে নিয়ে ছাদে গেলেই ভাল হতো। এখন কি আর করা যায়। বিড়ম্বনার মাঝে দুর্গাবতীর উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। রাজবৈভব। সু-সজ্জিত কক্ষ। চারিদিকে ফুলের স্তবক। ধূপদানী হতে অগুরুর সৌরভ ছড়িয়ে পড়তো। মখমলের বিছানায় বাতায়ন পথে মৃদু মৃদু পবনের পরশ বুলিয়ে দিত। সব ছেড়ে কিনা শিল'হাদী এমন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসেছে।

শিলাহাদী চারিদিকে তাকায়। বাঁকা চাঁদের আলো মেহেদি কুঞ্জের এক পাশকে আধো অন্ধকারে ঢেকেছে।...পেয়েছে।...এতক্ষণ ধরে শিলাহাদী যা খুঁজছিল—নিরিবিলি কুঞ্জ। আব কাল বিলম্ব না করে, দুর্গাবতীকে আস্তে করে হাত ধরে ওখানে এনে বসায়। রুক্ষ মৃত্তিকা। চিন্তা করার অবসর কোথায় ? উত্তেজনায় ধমনীতে রক্ত দৌড়ায়।

আধো অন্ধকার। তবু দুর্গাবতীর অবগুণ্ঠন সরিয়ে কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করে শিলাহদী। সফল হয় না। সরস ঠোঁটতো কিছু করতে পারে। দুর্গাবতীকে বাহুতে নিয়ে কাত হয় কুঞ্জের ছায়ায়। রাণীর দেহে চন্দনের সুগন্ধের আবেশ। শিলাহাদী মাতোয়ারা। ডুবে যায় আনন্দের গহীনে।...কতক্ষণ কেটেছে মনে নেই। শেষ রাতে শিলাহাদী দুর্গাবতীকে নিয়ে চুপিসাড়ে মহলে ফিরে আসে।

প্রভাত। দুর্গাবতী রায়সেন কেল্লার ভিতর আড়মোড়া ভেঙ্গে অনুমান করে, কোথায় ও। মেবার কন্যা।...মেবার। সে বহু শত যোজন দূর। এখানে পাহাড়ের উপর প্রাসাদ। শিলাহাদী গভীর ঘুমে অচেতন—মুখ মণ্ডলে তৃপ্তির আমেজ।

দুর্গাবতী খুব সন্তর্পণে শয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করে। শিলাহাদীর একটা হাত, ওর পিঠের পাশে আবেশে পড়ে আছে। ওদিকে একটু তাকায়। যাতে শিলাহাদীর নিদ্রাভঙ্গ না হয়। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে পড়ে।

সামনের গবাক্ষে মখমলের পর্দা হাল্কা হাওয়ায় দোলে। ধীরে ধীরে দুর্গাবতী ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। দিগন্তে হাল্কা লালিমার আভাস। সূর্য ওঠার মুহূর্ত। উষাকাল, পাখির কাকলীতে মুখর।

দুর্গের তিন দিক বনে ঘেরা। তার মাঝে মাঝে একক বিশাল নিঃসঙ্গ শালগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নানা প্রকারের গাছপালার ভীড়। মেবারের রুক্ষতার বিপরীত।

দুর্গের উপর অনেকখানি স্থান সমতল। দুর্গাবতীর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হয়। কিছু দূরে বহু লোকের আনাগোনা অনুমান করে। আবছাভাব কেটে আসছে। পূর্ব প্রান্তে রক্তিম আভা। সূর্যোদয়ের আভা।

আঃ...দুর্গাবতী চমকে ওঠে।

শিলাহাদী কখন ঘুম থেকে উঠেছে, রাণী টের পায় নি। চুপি চুপি এসে ওকে জড়িয়ে ধরে। ঘোমটা সরে গেছে। শিলাহাদী ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে চিবুকটা ধরে দেখতেই থাকে। রূপের ঐশ্বর্য। টানা আঁখি। পাতলা রাঙা ঠোঁট।

দুর্গাবতী নিজেকে মুক্ত করার বৃথা চেষ্টা করে। চোখ বোজে আবেশে। শিলাহাদীর অশান্ত বাহুর মাঝে নিজেকে ছেড়ে দেয় কাণ্ডারীবিহীন অসহায় তরীর মত।

একটু পরে শিলাহাদী বলে—দেরী হয়ে গেছে আজ। দূরে যা' দেখছিলে, ওখানে আমায় যেতে হবে। সৈন্যরা লড়াই অভ্যাস করছে। রোজকার নিয়ম মাফিক কাজ।

কথাটা বলে যেন শিলাহাদী নিজেই একটু লজ্জিত হয়। পরে শিলাহাদী তালি বাজায়। একজন দাসী হাজির হয় মল বাজিয়ে। হুকুম শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

—রাণীকে স্নান ঘরে নিয়ে যাও। আর আমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলো।

দাসী একটু অবাক হয়। ওর প্রভু রোজতো এত সকালে জলখাবার চান না। মাথা নত করে অপেক্ষা করে কখন রাণী ওর সাথে যাবে।

—প্রভু, কোন স্নানঘরে নিয়ে যাবো ?

শিলাহাদী বুঝতে পারে দাসীর মনের কথা।

স্নান মানে তো বিশাল ব্যাপার। একটু দূরে। মহলের অন্তদিকে। সেখানে কেবল রাজা রাণীর প্রবেশ অধিকার। সকালে নিদ্রা থেকে উঠে অতো দূরে রাজ পরিবারের কেউ বড় একটা যায় না। শয়ন ঘরের পাশে স্নানঘরে হামেশা স্নানপর্ব সমাধা করে।

বৃহৎ স্নান ঘর। রাজসিক ব্যাপার। ছয় থাম বিশিষ্ট বিশাল হলঘর। মাঝখানে জল রাখার বৃহৎ আধার। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর আলপনার মেলা। ওর মাঝে ছোট ছোট খুপরী—সুবাসিত তেল, চন্দন চূর্ণ রাখা আছে। বন্য ফলের শুকনো খোসাও আছে দেহের ক্লেদ পরিষ্কার করার জন্য। শাড়ি, ওড়না, কাঁচুলী—থরে থরে সাজানো। পুরুষের বেশভূষাও আছে। ঘরের ভিতরটা আরো অন্ধকার।

মহল পার হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে সমতলে নেমে আসতে হয়—তবে হামাম। সামনে সুন্দর বিস্তৃত জমি। ফুলের বাহার। সতেজ দূর্বাও জায়গা করে নিয়েছে এক কোণে। স্নানের পর, রৌদ্রে একটু আমেজ নেওয়া। নরম ঘাসের উপর দেহ এলিয়ে দেওয়া। গ্রীষ্মের রাতেও আরাম করা যায় নিরিবিলিতে।

দাসীর দিকে তাকিয়ে শিলাহাদী ইশারা করে। দাসী অপেক্ষা করে দুর্গাবতীর জন্য। ও সবে রাণী হয়ে এসেছে এখানে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দাসীই সামলে দেয়। রাণীর কাছে এসে, একটু নিচু হয়ে, অভিবাদন করে ওকে আহ্বান করে।

—আসুন মহারাণী—বলে—রাণীর কাছে এগিয়ে যায়।

দুর্গাবতী যেন বল পায়। এক পা এগিয়ে যায়। পরে ধীরে ধীরে দাসীর পিছনে চলতে থাকে।

দাসীর মলের ঝম ঝম শব্দ আর দুর্গাবতীর পায়েলের ঝিমি ঝিমি শব্দের দিকে চেয়ে দেখতে থাকে শিলাহাদী। ওর মুখে হালকা হাসি খেলে যায়।

দুর্গাবতী ফিরে আসতে আসতে শিলাহাদী ততক্ষণে নিজে তৈরী হয়েছে। আচকান পরা, পুরো যোদ্ধার বেশ। মাথায় কেবল শিরস্ত্রাণ নেই। দুর্গাবতী ওকে এক পলকে দেখে, উৎফুল্ল হয়। প্রাতঃরাশ শেষ করে। একটু হালুয়া জোর করে দুর্গাবতীকেও খাইয়ে দেয়। আদর করে গালটা টিপে দেয়।

শিলাহাদী উঠে দাঁড়ায়। মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে। বাঁ হাত দিয়ে দুর্গাবতীর হাত ধরে আকর্ষণ করে। সোহাগের ক্ষণিক শিহরণ বয়। পরে দ্বারের দিকে এগোয়।

মহলের বাইরে ঘোড়া তৈরী। ওকে যেতে দেখে দুর্গাবতী জানালা দিয়ে। শিলাহাদী একবার পিছন ফিরে দেখে। জানে, রাণী ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেই। নববধূ যে⋯।

শিলাহাদী অশ্ব নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে চলে যায়। যৌবনের দুরন্ত প্রতীক।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার। ঘোড়া ছুটছে। ধুলোর হালকা মেঘ পিছনে। সূর্যের তেজ বাড়ছে। ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে গেল—কয়েকটা ছোট গাছের আড়ালে। শিলাহাদীকে দেখতে পায় না আর দুর্গাবতী। ভাবলে ছাদের উপর, গম্বুজের পাশে যেতে পারলে বোধ হয় ওকে আরও কিছুক্ষণ দেখতে পাবে। কিন্তু ছাদে ওঠার সিঁড়ির সন্ধান জানে না ও। দরকার কি? উতলা হবার কি আছে। সবই জানা যাবে ধীরে ধীরে...।

এবার দাসী অভিবাদন করে বলে—মহারাণী, স্নানের আয়োজন করবো?

দুর্গাবতী মাথার নিজের ওড়না মুখ থেকে সরিয়ে, ওকে দেখে। পরীক্ষা করে। একটু খুঁটিয়ে।

দাসী মাঝারী বয়সের। যৌবন প্রায় পার হয়ে গেলেও, দেহ একেবারে আমাবস্যায় ঢাকেনি। ক্ষীণ চাঁদের ম্লান আলো এখনও ছড়িয়ে আছে কিছুটা ওর অঙ্গে। রাণীর দৃষ্টির সামনে বোধহয় একটু সঙ্কুচিত হয় ও। মাথার ওড়নাটা কপালের উপর টানে। যদিও রাণীজী মুখে কিছু বলে নি, তবুও ওর দৃষ্টিতে কিছু যেন ধরা পড়েছে। দুর্গাবতীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাঁসি খেলে যায়। মেবারের রাজকুমারী। দাসী-দাসীর মাঝে শিশুকাল হতেই বড়ো হয়েছে। ওদের সংখ্যা এখানকার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী হবে বোধ হয় চিতোরের মহলে। ওর সাথেও, অনেক দাসী এবং একজন খাস-দাসী পাঠিয়েছেন ওর পিতা। ইচ্ছা করেই দুর্গাবতী তাকে মহলের অন্যত্র আশ্রয় নিতে বলেছে। প্রথমে এখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে নিজে ওয়াকিবহাল হওয়া যাক, তারপর ঐ দাসীকে নিজের জন্য নিয়োগ করা যাবে।

—না, এত তাড়ার কি আছে? একটু পরে করবো'খণ—উত্তর দেন দুর্গাবতী।

দাসী আর কিছু না বলে, মাথা দুলিয়ে সহবৎ জানিয়ে চলে যায় মল বাজিয়ে। কিন্তু যাবার পূর্বে দুর্গাবতীর দিকে একটু বক্রভাবে কি দেখলো যেন! ঠোঁটের কোণে কি হাসি খেলে গেল ওর! ব্যাপার কি? 'তাড়া' কথাটা বলার জন্য নাকি? এমন ভাবটা কি ওর চাহনীতে ছিল? বোধ হয় নয়! গত রাতের মধু যামিনীর কথা চিন্তা করে ঠোঁটে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কিন্তু দাসীর অমন বেয়াদবী করার ধৃষ্টতা হতে পারে কি? যতো সব বাজে কল্পনা...!

দুটো চড়ুই পাখি ফুরুৎ করে উড়ে যায়। দুর্গাবতীর খেয়াল হয়। দাসীর কথা চিন্তা করে…সোহাগ রাতের মোহময় স্মৃতির আবেশে ডুবে গিয়েছিল সে। শিলাহাদী ওকে নিয়ে ফুলশয্যার রাতে 'সরোবরের মেহেদি কুঞ্জে কয়েক প্রহর কাটিয়েছে…। তার আবেশ এখনো কাটেনি ওর।

৭

ঘোড়ার খুরের শব্দে চকিত হয় দুর্গাবতী। শিলাহাদী ফিরেছে। দুর্গাবতী মাথার ওড়না, চোখের উপর নামায়—হীরের নাকছাবি বরাবর। হলুদ আবরণীর ভিতর লজ্জাজড়িত চোখ দুটো পুলক মাখা। বুকের ভিতর দুরু দুরু শব্দ। আবার রাজা কি করে, কে জানে !

শিলাহাদী কক্ষের মাঝে এসে দাঁড়ায়। এক এক করে সাজ-সজ্জা ত্যাগ করে। ঘর্মাক্ত কলেবর। পরিশ্রান্ত। সৈন্যদের সাথে মহড়ায় ভাগ নিয়েছে—তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায় ওর দেহে। মাথার চুল এলোমেলো। ক্লান্ত ও।

দুর্গাবতার দিকে এগোয় শিলাহাদী। দুর্গাবতী সংকুচিত হয়। তবু বস্ত্র দিয়ে শিলাহাদীর পিঠের হাতের ঘাম মুছে দেয়। শিলাহাদীর মন খুশীতে ভরে ওঠে। রাণী নূতন। আদর ভাল লাগে। শিলাহাদী ওকে থামিয়ে দেয়। চিবুক ধরে টিপে দেয়।

—রাণী, গতকাল রাতে তোমায় নিয়ে যেখানে গিয়েছিলাম, ওখানে বাগিচা বানাবার নির্দেশ দিয়ে এসেছি। গোলাপ, বেলার মেলায় তুমি আর আমি চুপিসাড়ে যাবো। মাঝে মাঝে…।

দুর্গাবতী ওড়নার ভিতর দিয়ে স্বামীর দিকে দেখে, ফের চোখ নামিয়ে নেয়। আনন্দে মনটা নেচে ওঠে। শিলাহাদী এবার বসে। রাণীকেও কাছে আসতে ইশারা করে। ও একটু ইতস্ততঃ করে, তবু কাছে আসে।

—বসো। দুর্গাবতীর হাত ধরে বসায়।

—শিলাহাদী তালি বাজায়। রাণীর চোখে বিস্ময়! কারণ ও একেবারে রাজার কাছে বসে আছে। দাসী এসে ওকে এইভাবে দেখবে। লজ্জা করে ভেবে। রাণী চকিতে একটু তফাতে বসে।

এবার দু'জন দাসী প্রায় একসাথে মলের শব্দে ঝড়ের সংকেত দিয়ে প্রবেশ

করে। একজনের হাতে রেকাবি। কিছু ফল, মিষ্টি আর সরবৎ। অন্যের হাতে বিশাল আয়তনের তালের পাখা।

শীলাহাদী শুধু সরবৎ নেয়। দাসী পাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে। একটু পরে, সরবতের খালি পাত্র ফেরৎ দেয়। শিলাহাদী ফল মিষ্টি নেবার কোন প্রয়াস করে না। দাসী ফেরৎ যেতে থাকে।

এবার হঠাৎ দুর্গাবতী তালি বাজায়। দাসী চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ায়। হাতের ইশারায় কাছে আসতে বলে। দাসী এসে নত মস্তকে দাঁড়ায়। দুর্গাবতী ওর হাত থেকে ফল মিষ্টির রেকাবি নিয়ে নেয়। হাতের ইশারায় ওকে চলে যেতে বলে। দাসী অদৃশ্য হয়।

শিলাহাদী, রাণীর দিকে দেখে, মুচকি হাসে। কিছু বলে না। জিজ্ঞাসাও করে না কিছু। অপেক্ষা করে। দেখা যাক কি করে দুর্গাবতী।

এবার দুর্গাবতী অন্য দাসীকেও চলে যেতে বলে ইঙ্গিতে। দাসী চলে যাচ্ছিল। দুর্গাবতী ওর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে নেয়। দাসীর নয়নে প্রসন্নতা, মুখে কিছু বলে না। ওর বুঝতে বাকি নেই রাণী নিজে সেবার ভার নিচ্ছে রাজার।

—এ কি? সবাইকে বিদায় দিলে যে। তুমি কি এই কাজ করবে নাকি?

অবাক করা শিলাহাদীর প্রশ্ন।

দুর্গাবতী কিছু বলে না। কেবল মাথা নাড়ে।

একটু পরে উঠে, সত্যই পাখা নিয়ে হাওয়া করতে থাকে। শিলাহাদী বাধা দেয়। শোনে না দুর্গাবতী। বরং উল্টে ফলের রেকাবী নিয়ে শিলাহাদীর সামনে রেখে দেয়।

শিলাহাদী ভান করে। মানে কি করবে।

দুর্গাবতী পাখা রেখে দিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে। মিষ্টি স্বরে বলে—খান না।

শিলাহাদীর কি যেন হয়। উল্টে ওকে জিজ্ঞাসা করে—ও খেয়েছে কি না। দুর্গাবতী মাথা নাড়ে।

—আপনি না খেলে, আমি কি করে খাবো?

—এসো, আমরা এক সাথে খাই। তাড়াতাড়ি করো।

দুর্গাবতী একটু বিস্মিত হয়। তাড়াতাড়ির কথা শুনে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে।

—একটা কাজ আছে। তুমি স্নান করোনিতো?

—মাথা নাড়ে দুর্গাবতী। ভাবে, কিছুক্ষণ আগে দাসীও এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলো পতিও। কিন্তু না দাসীকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, আর স্বামীকে কিছু বলা নব বধুর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। লজ্জার একশেষ।

দুর্গাবতী মাথা নীচু করে। চুলের বেণীটা পাশে নেতিয়ে পড়ে আছে। পা মোড়া একদিকে। ক্ষীণ কোমর সাপের মত বাঁক খেয়েছে। ঘাঘরা পায়ের পাতার উপরে ওঠা। পায়ের পাতায় সুন্দর মেহেদির আলপনা। পায়েল একটু এক পাশে হেলে রয়েছে। টকটকে ফর্সা পায়ে, নীল শিরা উঁকি দিচ্ছে।

শিলাহাদী রাণীর দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ আলতো করে কাছে টানে। দুর্গাবতী প্রায় ওর পায়ের কাছে কাত হয়ে পড়ে। মাথার ওড়নাটা একটু সরে গেছে। ঝট্ করে পেঁপের এক টুকরো দুর্গাবতীর মুখের কাছে ধরে শিলাহাদী। দুর্গাবতী নিরুপায়। ও চুপচাপ মুখে পুরে নেয়।

শিলাহাদী বলে- এবার আমায় খাওয়াও।

দুর্গাবতী একটু বল পায়। এইকথা ওকে শক্তি দেয়—জড়তা দূর হয়। দুর্গাবতী এবার রেকাবী হাতে নিয়ে, স্বামীর মুখে ফল তুলে দেয়। খানিকক্ষণ চলে এইরকম। শেষে শিলাহাদী একটু জল খায়।

—স্নানের আয়োজন করতে বলি, দাসীকে ?

দুর্গাবতী ভাবে, কি বলবে।

—আপনি যান। পরে আমি করবো।

—সেইটেইতো চাই না আমি। স্নান দু'জনেও করা যায় এক সঙ্গে।

এ কথায় লজ্জায় মরে যায় দুর্গাবতী। দু'হাতে মুখ ঢাকে। ততক্ষণে শিলাহাদী তালি বাজায়। দাসী উপস্থিত। ওকে স্নানের ব্যবস্থা করতে বলে, মাথা নত করে, মল বাজিয়ে মাটিতে ঝংকার তুলে চলে যায় দাসী।

চলো। এসো...

শিলাহাদী ডাকে—সোহাগ ভরে। কিন্তু দুর্গাবতী অনড়। মৃদু স্বরে বলে—লজ্জা করে না আপনার !

হা হা শব্দে হেসে ওঠে শিলাহাদী।

—লজ্জা কিসের ? স্নানের ঘরে কেউ থাকবে না। তুমি আর আমি। দাসী এলে তুমি কিন্তু চলে যেও। পরে আমি আসবো—

অগত্যা দুর্গাবতী উঠে যায় দাসীর সঙ্গে। দাসী আগে আগে চলেছে।

মহলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সিঁড়ি ভেঙ্গে এবার চাতালে এসে পড়ে, ঘাসের উপর।

স্নানের স্বতন্ত্র জায়গা। কেবল রাজপরিবারের লোক ছাড়া অন্য কারোও এখানে আসা নিষিদ্ধ। স্নান ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে দাসী দূরে একটু নজর ঘুরিয়ে, সরে দাঁড়ায়। রাণীকে ভিতরে যাবার রাস্তা করে দেয়। দুর্গাবতী একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে। দাসীকে ভিতরে ডাকবে কিনা ইতঃস্তত করে। তখনই মনে উদয় হয় শিলাহাদীর কথা। এক সাথে স্নান করার ইঙ্গিত দিয়েছে। দাসী থাকলে কি তা' সম্ভব। যদি সরোবরে অবগাহনের জন্য যেতো, তা'হলে কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু ঘরের ভিতর স্বামী স্ত্রী থাকবে—দাসীর থাকা অসম্ভব। শিলাহাদী কি হুট্ করে ঢুকে পড়বে নাকি ?

এমন চিন্তা করতে করতে, আলতো করে পা ফেলে, স্নান ঘরে প্রবেশ করে। বাইরে থেকে ভিতরে এসে, অন্ধকারের মাঝে ধাঁধার মত লাগছে। পর্দার ছিদ্র অন্বেষণ করে, এক চিলতে আলো ভিতরে এসেছে। ভালো করে ঘরের ভিতরটা পরীক্ষার চেষ্টা করে দুর্গাবতী। যেখান দিয়ে হালকা আলো আসছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথার ওড়না খুলে রাখে। চুলের বেণী খোলে। আঙ্গুল দিয়ে চুলকে আলগা করে। চুল যেন কালো বন্যার ঢেউ।

হঠাৎ আঃ করে ওঠে দুর্গাবতী আতঙ্কে। চিৎকার করার আগেই, শিলাদহী চাপা স্বরে বলে—আমি, ভয় নেই...শিলাহাদী পিছন দিক হতে ওকে ধরে।

ভয় নেই বললেও, তখনও দুর্গাবতী থরথর করে কাঁপছে। বুক বস্ত্রশূন্য। দু'হাত দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে। যদিও কাঁচুলী আছে।

—একি ? কাঁপছ কেন ?

দুর্গাবতীর কাঁপুনি ক্রমে কমতে থাকে। শিলাহাদীর দু'হাতের বেষ্টনীর মাঝে ভাবতে থাকে, কখন ও এসেছে টের পায়নি। দুর্গাবতীর কিন্তু রাগ হয়। শিলাহাদীর হাতের বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করে, ফলে, হঠাৎ পা ফসকে, পাশে জলের চৌবাচ্চায় দু'জনে পড়ে যায়।

দুর্গাবতীর হাত ধরে টেনে কাছে আনে শিলাহাদী। বক্ষবাস জলে ভাসে। নীবিড় বন্ধন শিথিল হয়। চন্দনের গুঁড়ো দুর্গাবতীর সর্বাঙ্গে ঘসে দেয় শিলাহাদী। সরমে মরে দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী স্নান সেরে, নূতন বস্ত্র পরে, কক্ষত্যাগ করে। তারপর, যেমন চোরের মত শিলাহাদী ভিতর প্রবেশ করেছিল, তেমনি চুপিসাড়ে চলে যায়। দুর্গাবতী

ভাবে, দাসী কিছু টের পায়নি তো ! কিন্তু ও জানেনা আসলে দাসীকে দূর হতে ইশারায় চলে যেতে বলেছে শিলাহাদী। এ কথা জানতে পারলে বোধহয় দাসীকে আর মহলে পা রাখতে দিত না দুর্গাবতী। অন্তঃপুরে এ এমন কিছু নয়। দাসীরা তো দূতী। অনেক গোপন পথের খবর রাখে। অসম্ভবকে সম্ভব করে।

সন্ধ্যার কোলে, কেল্লার পশ্চিমে লাল আবিরের রঙ ছড়িয়ে সূর্য ডুব দিতেই শিলাহাদীর চোখে অন্য রঙ ধরে। নিজে নূতন পোষাক পরে। দুর্গাবতীর জন্য নূতন ঘাঘরা, চোলি আর ওড়না আনে। ওড়নার বাহার দেখে, দুর্গাবতী মুগ্ধ। সামান্য একটা ওড়না। কিন্তু এত হালকা আর পাতলা যে তুলনা হয় না। দুর্গাবতী বার বার পরীক্ষা করে। চোখে বিস্ময়ে ভরা প্রশংসা।

—সিরোঞ্জে তৈরী ওড়না। বহু যুগ ধরে, ওখানের তাঁতীরা এমন সুন্দর জিনিস বানাচ্ছে। মসলীন। এর সূক্ষ্মতা অতুলনীয়।

—সিরোঞ্জ ! কোথায় সে জায়গা ?

—আমার রাজ্যর মধ্যে পড়ে। বিদিশার আগে। ওখানের প্রজারা নূতন রাণীকে ভেট দিয়েছে।

দুর্গাবতী তখনও ওড়না হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করছে। পরে কক্ষান্তরে চলে যায়। তালি বাজায়। দাসী আসে।

—আমার চূড়া বেঁধে দাও।

দুর্গাবতী একটা বেদীর উপর বসে। দাসী পিছনে হাঁটু মুড়ে, ওর চুলের পাট ভেঙ্গে ভেঙ্গে আঁচড়াতে থাকে। তারপর বাহারের করে বেণী বাঁধে। জুঁই ফুলের মালা জড়ায়। কপালে টিপ আর চোখে কাজলের রেখা টানে। কঙ্কন হাতের, হার বক্ষের আর কোমর বিছে নিতম্বের শোভা বাড়ায়।

শেষে বেশ পরিবর্তন। চোলির সুতো বেঁধে দেয় দাসী। কিন্তু সিরোঞ্জের ওড়না নিজের হাতে ঠিক করে নেয় দুর্গাবতী। দাসী সামনে আয়না ধরে। দুর্গাবতী মাথা ঘুরিয়ে কেশ বিন্যাস পরীক্ষা করে। মনেই হয় না কোন দুপাট্টা মাথার উপর বিদ্যমান। অপূর্ব সূক্ষ্মতার নিদর্শন।

দুর্গাবতী মনে ইন্দ্রধনুর জাল বোনে। শিলাহাদী কেন এসব পরতে দিয়েছে। সব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। রাজা যখন বলেছেন, নিশ্চয় কোন মতলব আছে। জানা যাবে পরে।

—একটু আরও জোরে বাঁধতো—

দাসী কিছু বুঝতে পারে না, রাণীজী কি বলছেন। বোকার মত তাকায়।

—আরে, পিছনের সুতোটা।

এবার ও বুঝতে পারে। কাঁচুলির সুতোটা বাঁধতে বলছেন। তাই করে সে।

—ব্যস্।

শিলাহাদী পাশের ঘরে পায়চারী করছে। কক্ষে দীপ জ্বালানো হয়েছে। বাইরে আকাশে দু'একটা করে তারা বাতি জ্বালাতে শুরু করেছে। দুর্গাবতী ধীরে ধীরে এ ঘরে আসে। খুশীভরা নয়নে রাজস্থান দুহিতাকে প্রাণ ভরে দেখে শিলাহদী। জোয়ার ভরা দেহ। রূপের বান ডেকেছে।

—বাইরে খবর দাও, আমরা আসছি।

দাসীকে হুকুম করে শিলাহাদী। দাসী চলে যায়। শিলাহাদী এবার দুর্গাবতীর নিকটে এসে ওর একটা হাত তুলে নেয় নিজের হাতে।

— এসো।

দুর্গাবতী চলতে থাকে বিনা দ্বিধায়।

প্রাসাদের দ্বার পাব হতেই, দূবে অনেক লোকজনেব জটলা নজরে পড়ে। কয়েকজন দাসী। ওদেব হাতে বড় বড বেকাবি। উপবে কাপড়ের ঢাকনা।

কয়েকজন ববকন্দাজ। অস্ত্রহীন তাবা। ঢোল, নাকাড়া গলায় ঝোলানো তাদের।

রাজা-রাণীকে মহল হতে বের হয়ে আসতে দেখেই, মহারাজা কি জয় বলে, সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।

পরক্ষণেই ভেরী নিনাদ হয়। ঢোল, নাকাড়া বেজে ওঠে।···বরকন্দাজরা ধীবে ধীরে এগোতে থাকে। পিছনে দাসীর দল, অনেক তফাতে শিলাহাদী দুর্গাবতকে নিয়ে—সকলের দৃষ্টি থেকে তাকে একরকম আড়াল করে—ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

খানিকটা পথ অতিক্রম করে—সবাই এসে খরবুজা মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়। মন্দির সংলগ্ন বকুল গাছের তলায় অপেক্ষা করে শিলাহাদী। পুরোহিত মন্দির থেকে বের হয়ে আসেন। ওরা প্রণাম কবে তাঁকে। উনি আশীর্বাদ করেন। পরে মন্দিরে প্রবেশ করে। মন্দিরের উপরিভাগ গোলাকার। তার গায়ে দাগ কাটা। হালকা গৈরিক রঙ। ফুটির মত দেখতে মন্দির—তাই খরবুজা নাম।

রাণীর পিছনে দাসীরা রেকাবি নিয়ে আসে। ফল, মিষ্টি, পুষ্প ভরা রেকাবি। শিলাহাদী, বিশেষ রেকাবিটি দুর্গাবতীকে দিতে বলে দাসীকে। রেকাবি নিয়ে

দুর্গাবতী অপেক্ষা করে। ততক্ষণে, পুরোহিতও শিব লিঙ্গের পাশে এসে দাঁড়ান। ধূপ, দীপ জ্বলছে।

ওঃ নমঃ শিবায়। পুরোহিত পূজা শুরু করেন। রাজা রাণী পুষ্প অর্ঘ দেন। প্রণাম সেরে মন্দির হতে বের হয়ে আসেন তাঁরা। ভেরী নিনাদ হয় আবার। পূজা সমাপ্ত হয়। রাজ-কার্যাবলীতে সব ঘোষণা হয় পূজার পূর্বে ও পরে। তার আভাস পাওয়া যায়।

ঢোল, নাকাড়া বাজতে থাকে। এবার প্রাসাদে ফেরা শুরু হয়। রাত্রি আসর পেতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দু'একটা পাখি উড়ে গেল।

দুর্গাবতীর মন ভরে যায় পতির সাথে মন্দিরে পূজো দিয়ে। হঠাৎ গত রাতের কথা মনে পড়ে। আজও কি শিলাহাদী ওকে সরোবরের ধারে নিয়ে যাবে নাকি? মহলের দ্বার পার হয়ে ওরা ভেতরে যায়।

৮

রাতে কাজের বাঁধন আলগা হতে থাকে। কেল্লার ভিতরে কর্মচাঞ্চল্যে সন্ধ্যার পর ঢিলে পড়ে। সৈন্যেরা যে দিকে থাকে, সেদিক ছাড়া অন্য দিকগুলো খাঁ খাঁ করে। অবশ্য কখনও কখনও নর্তকীর নূপুর নিক্কনে প্রাণবন্ত হয় দরবার কক্ষ এই সময়ে।

সৈন্যদের থাকার ঘরের টানা লম্বা সারি, ছোট বড় পাথর দিয়ে তৈরী। ছাদেও পাথর। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সারা হয় ওদের। তারপর যদি কোন কথক ঠাকুরের দয়া হয়, তবে উনি সুর করে রামায়ণ পাঠ করেন শ্রোতারা ভক্তি-ভরে হাত জোড় করে শোনে।...কোথাও খোল-করতালের আসর বসে। কীর্ত্তন হয় প্রভুর নাম। একজন কীর্ত্তনিয়া। বাকি সব দোহার বনে যায়।...কেউ এক-তারা নিয়ে বাউল সুরে গান ধরে।

সৈন্যদের প্রতি গ্রাম থেকে পালা করে এখানে আনা হয় স্বাভাবিক সময়ে। যুদ্ধর সময়, ডাক পড়লে ওরা এসে হাজির হয়।

খানিক দূরে দূরে মশাল জ্বলে। প্রহরী ঘুরে ঘুরে দেখে। দুর্গের কোণে কোণে প্রহরীদের উঁচু স্থান নির্দিষ্ট, যেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত নজর রাখা যায়। শত্রু নামটাই আতঙ্কের—কখন কোথা থেকে কোন ফাঁকে এসে পড়ে।

প্রাসাদে দরবার বসে গভীর রাত পর্যন্ত। রাজ্যের খবরাখবর নেয় শিলাহাদী। বিদিশা, সারঙ্গপুর, আস্টা হতে দূতরা আসে। সমস্যার কথা শোনে। উজ্জয়িনী,

মাল্‌বের নবাব ভেট হিসাবে দিয়েছে শিলাহাদীকে। রাজকর্মচারী আসে কর জমা দিতে। করই তো রাজ্যের ধমনীর রক্ত, অর্থনীতির পোক্ত বুনিয়াদ।

একটু বেশী রাত করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শিলাহাদী। রাজকার্য শেষ করতে সময় লাগে। দূতেরা রাজার অতিথিশালায় চলে যায়। রাত্রিবাস করে সেখানে। প্রভাতে রওনা দেবে যে যার গন্তব্যস্থল অভিমুখে।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে দেখে, দুর্গাবতী শয্যায় কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে। বেচারী! বোধহয় রাজার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলো। তারপর তন্দ্রায় ওকে ঘিরে ধরে। শিলাহাদীর প্রবেশ টের পায়নি ও। খুব সন্তর্পণে দুর্গাবতীর ওড়না একটু সরায়। এরপর ক্ষুধার্ত ওর মুখ নেমে আসে দ্রাক্ষাসবের মত দুর্গাবতীর ঠোঁটের উপর। ভয় পেয়ে উঠতে গিয়ে, দুর্গাবতী নড়তে পারে না। খুব ধীরে ধীরে বলে শিলাহাদী আজ খিদে নেই।

দুর্গাবতী কিছু বলে না, ওড়না ঠিক করে। চোখে তার জিজ্ঞাসা। খাবে না কেন শিলাহাদী!

—সন্ধ্যায় অনেক প্রসাদ খাওয়া হয়েছে।

দুর্গাবতী উঠে চলে যাবার চেষ্টা করে, শিলাহাদী আরও জোরে ওকে জড়িয়ে ধরে।

—আজ অল্প কিছু খেয়ে, তারপব—বলে, শিলাহাদা চুপ করে। দুর্গাবতী চিন্তা করে। আজ আবার কোন পথে যাবে?…রাজপথে।…না সরোবর তীরে।…না স্নানাগারে!

—তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করছ না?

দুর্গাবতী চুপ। ওর হাতের বাঁধনে আটকা। শিলাহাদী উঠে যায়। নিজেই পাথরের বাটি নিয়ে ফিরে আসে। মালাইয়ের সর বিছানো দুধে কেশরের কণা উঁকি দিচ্ছে। নিজে চুমুক দেয়। এবার দুর্গাবতীর দিকে বাটি এগিয়ে দেয়। দুর্গাবতী কি করবে? বাটি নেয়। পরে রেখে দেয়।

—ওকি রেখে দিলে কেন? আচ্ছা তোমার তো খাওয়া হয়নি। তুমি আগে খেয়ে নাও।

—না, আমারও খিদে নেই।

—কেন? আমি না হয় অনেকখানি প্রসাদ খেয়েছি, কিন্তু তুমি?

—আজ্ঞে হাঁ। আমি বাকি প্রসাদটুকু শেষ করেছি।

—তাহলে এসো। তোমায় অপরূপ এক জিনিস দেখাবো। বলে, ওর হাত

ধরে নিয়ে চলে শিলাহাদী। কক্ষের বাইরে মশাল জ্বলছে। বারান্দার কোণে কোণেও। রাতভর জ্বলবে।

শিলাহাদী ছোট একটা দরজার পাশে এসে একটা মশাল তুলে নেয়। দুর্গাবতীকে নিয়ে এগিয়ে চলে। সামনে সিঁড়ি উপরে ওঠার। ছাদের। আঁকা বাঁকা সিঁড়ি।

ছাদের উপর ছোট কুঠরী। দুর্গাবতীকে ওখানে নিয়ে যায় না। কেবল তাব দরজার পাশে মশালটা রেখে ফিরে আসে।

এদিকে এসো।

বলে, দেওয়ালের পাশে নিয়ে যায়। সামনে বিশাল দিগন্তব্যাপী মাঠ। ছাঁদে দাঁড়িয়ে এক এক দিক দেখায় দুর্গাবতীকে। চাঁদের আলোয় ভরা মায়ায় ঘেবা রাত। শিলাহাদী দেখায় একদিকে ভূপাল। অন্যদিকে সাঁচী, বিদিশা।

সাঁচীর নাম শুনতেই, দুর্গাবতী একটু সচকিত হয়। কাল বাতেও শিলাহাদী ঐ নাম বলেছিল। জায়গাটাব কি বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে নাকি?

সাঁচীতে কি আছে? গতকাল রাতেও আপনি ঐ নাম বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। ঐ স্থান আমার রাজ্যেরই অংশ। আর ওখানে কি আছে, না দেখলে বুঝতে পাববে না। আমি বলেও বোঝাতে পারবো না। যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখবে, ধারণা কবতে পারবে না।

—কতদূর।

—খুব কাছেই। কয়েক ক্রোশ দূবে। যাবে?

—তা' কি এখনই নিয়ে যেতে চান?

—তুমি যদি যেতে চাও, আমি রাজি।

—কিন্তু কি দেখার আছে ওখানে? রাতে কি তা ভাল করে বোঝা যাবে?

—ঠিক বলেছো। রাত্রে বোঝা গেলেও, আনন্দ পাবে না। দিনেই যাবো।

—তবু ভাল। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি এখনই যাবেন...

—কেন? যেতে পারা যায় না।

দুর্গাবতী মাথা নাড়ে।...না...

—কেন?

দুর্গাবতী একটু দূরে সরে যায়। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে—জানি না।

দুর্গাবতীর উত্তর ইঙ্গিতে ভরা। শিলাহাদীর মাথায় আগুন ধরে। দুর্গাবতীর কাছে এসে হাজির হয়। এসেই কোল পাঁজা করে ওকে তুলে নেয়। দুর্গাবতী

এরজন্য প্রস্তুত ছিল না। দুর্গাবতী আঃ আঃ করে, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে ওঠে।

শিলাহাদী ভ্রুক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি চলতে থাকে অন্য দিকে। দুর্গাবতী ভাবে, এইভাবে কি ওকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামবে নাকি। হুড়মুড় করে পড়ে যাবে যে। হাড়গোড় ভাঙবে। কিন্তু শিলাহাদী সিঁড়ির দিকে না গিয়ে, যেখানে মশাল পুঁতেছিল সেইদিকে চলে।

প্রশস্ত ছাদ। মালব প্রদেশে বার মাসই হালকা হাওয়া বয়। এখানে হাওয়া একটু বেশী অনুভূত হয়। শিলাহাদীর হাতের মাঝে রূপবতী। ঠাণ্ডা হাওয়া ভালই লাগে। দুটি অজানা পাখি সংগীত শুনিয়ে অন্য দিশায় উড়ে গেল। দুর্গাবতীর অস্বস্তি বাড়তে থাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হলো না পরিণতিতে পেঁছানোর জন্য। শিলাহাদী জ্বলন্ত মশালকে পাশ কাটিয়ে, ছোট কুঠরার ভিতর ঢোকে। দুর্গাবতী কিছু বোঝার আগেই, ওকে নামিয়ে দেয়। না, শুইয়ে দেয়।

এবার দুর্গাবতী চোখ মেলে তাকায়। ওড়না মাথায় নাই। ঘাঘরা উপরে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি। ঘর প্রায় অন্ধকার। বাইরে থেকে মশালের হালকা আলো ভিতরকে উজ্জ্বল করার বিফল প্রয়াস করে। শিলাহাদী ওর পাশে বসে, দুর্গাবতীর বুঝতে অসুবিধা হয় না শিলাহাদীর পূর্ব পরিকল্পনা। এবার শিলাহাদী পাগলামী শুরু করেছে।

প্রাসাদের বাইরে সাধারণতঃ রাণীরা যান না, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। পর্দার আড়ালে জন চক্ষুর নাগালের বাইরেই থাকেন তাঁরা। একদিন শিলাহাদী প্রস্তাব করে। সৈন্যদলের কুচ্‌কাওয়াজ হবে—যদি দুর্গাবতী যেতে চায়, তার ব্যবস্থা করবে।

—সৈন্যদের সামনে আমি কেমন করে যাবো?

—তার চিন্তা নেই। সে ব্যবস্থা করবো। মেবারে কি কখনও তুমি কুচ্‌কাওয়াজ দেখনি?

দুর্গাবতী মাথা নাড়ে। না, দেখেনি।

কয়েকদিন পর—শিলাহাদী ওকে বলে—কাল বিকেলে তৈরী থেকো। সব ব্যবস্থা করেছি।

—কিসের?

—কেন? মহড়া দেখবে না? সেদিন বলেছিলাম না।

—কি দরকার। আপনিই আমার সব। আপনি ওদের শিক্ষা দিন। তাই আমার যথেষ্ট।

—তোমার কথায় আমার মন ভরে গেছে। তুমি জান না আমার জীবন কত সংঘর্ষে ভরা। তোমার বাবা যখন আমার কাছে সংবাদ পাঠান, সাহায্যের জন্য, মন আমার তখন আনন্দে নেচে ওঠে। মেবারের রাণা তখন মাণ্ডুর সুলতানের সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিদিশা, সারঙ্গপুর সুলতানের অধীনে ছিল।

—আপনি যে বলেছিলেন, এসব স্থান আপনার রাজ্যর মধ্যে পড়ে।

হাঁ। বলছি। রাণা সংগ যখন মাণ্ডু অধিকার করেন, আমি তখন এদিক দখলে আনি।

—তাহলে তার আগে থাকতেন কোথায় ?

—বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে, নদী নালার তীরে।

—কেন ?

—বুঝতে পারলে না ? এই অঞ্চলের লোকেরা আমায় সর্দার বলে মানতো। হাজার হাজার অনুগামী ছিল আমার।...ওরাই আমার বল।. ওরা আমার, আমি ওদের। আজ এখানে তো কাল অন্যকোথাও। এইভাবে কেটেছে আমার জীবনের প্রতিপল। যুদ্ধের সাজে ঘোড়ায় চড়ে যোজনের পর যোজন চলেছি। ঘোড়াই আমার প্রধান শক্তি। এ অঞ্চলের প্রতি পাহাড়ের খাঁজ আমার পরিচিত। ছুটে চলেছি। শেষ কোথায় জানি না। দুর্যোগপূর্ণ নিশির ঘোর অন্ধকারও আমায় ভীত করতে পারে না।

—এখন।

এখন তো মন, পবনের নাও। তোমাকে পাশে পেয়ে মন আমার পরিপূর্ণ। রাণার সাথে চুক্তির ফলে বিদিশা আর রায়সেন আমার হাতে আসে। বিদিশাতেও রাজধানী রাখতে পারতাম, কিন্তু ও জায়গা সমতলে। রায়সেন দুর্গ পাহাড়ের মাথায়।

দুর্গাবতীকে কাছে টানে। একটু আদর করে মংল হতে বের হয়ে যায়। একটু হেসে বলে যায়—তৈরী থেকো, চিন্তা নেই, পর পুরুষ আমার প্রেয়সীকে দেখবে না।

দুর্গাবতী ওর কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে। নাকের হীরে ঝিলিক মারে। দেহ আন্দোলিত হয়। খুশীর আমেজ উথলে উঠে।

মেবারে কোনদিন সৈন্যদলের মহড়া দেখার সুযোগ হয়নি দুর্গাবতীর। দুপুরের

পর, প্রাসাদ থেকে পালকী বের হয়ে আসে। আগে পিছে বরকন্দাজ। পালকী এসে তাঁবুর পাশে থামে। দুর্গাবতী পর্দার আড়াল হতে বের হয়ে এসে, তাঁবুর ভিতর চলে যায়। অবশ্য আগেই পালকীর বেহারারা চলে যায়। দাসীরা এসে পালকী ঘিরে ফেলে। তাঁবুর উপর নীল আকাশ। পাশে ছোট একটা শিশু গাছ। তার ছায়া সামিয়ানার কাজ করছে। চিকের ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে।

সৈন্যদল। কয়েক হাজার। মহড়া শুরু। হাতে ঢাল তলোয়ার। একে অন্যকে আঘাত করছে। ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ করছে। জোর আক্রমণ চলে কিছুক্ষণ···এরপর তীরন্দাজদের পালা। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর সোঁ সোঁ করে আকাশের বুকে উঠতে থাকে। বড় বড় বাঁশের মাথায় খেলনা পাখী টাঙ্গানো। তাকে তীর বিদ্ধ করছে। কেউ সফল হচ্ছে—আবার কেউ লক্ষ্যভেদে বিফলও হচ্ছে। উপস্থিত সবাই উল্লসিত। চিৎকারে আকাশ মথিত করছে। ...এরপর অশ্বারোহীর দল। মাথায় শিরস্ত্রাণ। হাতে বর্শা। প্রথমে কুচ্‌কাওয়াজ চলে। এক কোণ হতে অন্য কোণে। পরে, ওখান হতে ছুটতে ছুটতে এসে খুঁটিতে টাঙ্গানো বস্তুকে, বর্শা ফলকে বিদ্ধ করে। উল্লাসে ফেটে পড়ে সবাই। ···এক অশ্বারোহী কৃত্রিম উঁচু বাধাকে লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে বিফল হয়। অশ্বারোহী পড়ে যায়। কিন্তু অক্ষত। উঠে দাঁড়ায়। মুখে লজ্জার ভাব তার।

অপরাহ্নে ছায়া দীর্ঘ হতে থাকে। শিলাহাদী এতক্ষণ বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়ায়। পদাতিক, অশ্বারোহী—সবাই পংক্তিবদ্ধ হয়ে চলে রাজার সামনে দিয়ে। কুচ্‌কাওয়াজ করে চলে যায়।

মহড়া শেষ। সূর্য পাহাড়ের পিছনে ডুব দিয়েছে। এরপর শিলাহাদী ঘোড়ায় চড়ে দুর্গাবতীর তাঁবুর সামনে এসে হাজির হয়। বেহারারা পাল্কী এনে রেখে চলে যায়। দাসীর সহায়তায় রাণী ওতে চড়ে। শিলাহাদী আগে চলতে থাকে। পিছনে বরকন্দাজ। তার পিছনে পাল্কী। দাসীরা হেঁটে চলেছে।

৯

বর্ষা এলো—ঝম্‌ ঝম্‌ করে। কেল্লার পাশে পাহাড়ের চারপাশে জঙ্গলের মাথায় তোড়ে নামে বর্ষা। অসহায় গাছপালা বৃষ্টির জলে স্নান করে। বর্ষণের দাপটে পশু-পক্ষীরা অদৃশ্য হয়েছে, আনন্দে মেতে উঠেছে ময়ূর। কু উ···বৃক্ষ শীর্ষ হতে ডাক দিচ্ছে। প্রাচীর পার হয়ে রোহিণী মহলের মাথায় চড়ে পেখম মেলেছে। নৃত্যে মগ্ন।

বাদল মহল। বর্ষায় এই প্রাসাদের উপর মেঘের মনোরম জমাটি আসর বসে। মেঘ কখনো কখনো কালো ছায়ার আসর পাতে। আবার কখনো বা হালকা পরশ বুলিয়ে উড়ে যায় মহল পার হয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে। শিলাহাদী বাদল মহলের ছাদের কুঠরীতে, দুর্গাবতীর নিতম্বে হাত রেখে, দূরের নৈসর্গিক শোভায় বিভোর। ছোট অলিন্দ দিয়ে বাইরের বৃষ্টির হালকা ছাট ভিতরে এসে সাথী খুঁজছে। শিশির কণার মত মোলায়েম বৃষ্টি কণা দুর্গাবতীর মুখে আলপনা কাটছে।

শিলাহাদী আস্তে করে নিজের গাল, দুর্গাবতীর গালে চেপে ধরে। আবেশে, বিভোর। জলবিন্দু চেপে যায়। দুর্গাবতী নিজের গাল আলগা করতে গিয়ে বিফল হয়। শিলাহাদী ওর চেষ্টা ব্যর্থ করে। জলের ছোট কণা এবার ফোঁটার রূপ নিয়ে, ওদের দুজনকে ব্যতিব্যস্ত করে। মুখে, গলায় বিন্দু বিন্দু জল পড়ে, ভিজে ওঠে। বারিধারায় দুর্গাবতীর ওড়না বক্ষবাসও ভিজতে শুরু করেছে।

—তুমি ভিজে যাচ্ছ। কিন্তু এতো শুধু বর্ষায়ই হয়। বাকি বছর এর সুযোগ পাবে না। একটু ভেজ না।

দুর্গাবতী কিছু বলে না। স্বামীর কথাটা চিন্তা করে। ঠিকই। অল্প ভিজলে কি আর হবে। ক্ষণিকের ব্যাপার। শিলাহাদী যখন চাইছে না হয় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। পরক্ষণই তোড়ে বৃষ্টি নামে। দু'জনে ভিজতে থাকে। শিলাহাদী উদ্দাম, উচ্ছ্বসিত। দুর্গাবতীকে টেনে ছাদের অন্য কোণে নিয়ে যায়। প্রতিবাদ করার সময়ই পায় না দুর্গাবতী। মহলের গম্বুজের পাশে দুটি ময়ুর-ময়ুরী। যেন বৃষ্টির মাঝে ময়ুর পেখম মেলে নাচতে শুরু করেছে ময়ূরীর সামনে। আনন্দে টগবগ করছে। হঠাৎ শিলাহাদীর খেয়াল হয়। দুর্গাবতী ভিজে একাকার—কাঁপছে। ওকে নিজের দিকে টানে। কানের কাছে সোঁ সোঁ হাওয়ার সাথে শুনতে পায়, দুর্গাবতীর কাঁপা ঠোঁটের অসহায় মিনতি···ঠাণ্ডা লাগছে।

শিলাহাদীর হুঁশ হয়। সত্যই তো, ওরা দারুণ ভিজে গেছে। এবার দুর্গাবতীকে কুঠরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

বৃষ্টির সাথে, কালো মেঘের জাল কেল্লাকে ঘিরে ধরেছে। ঘরের কোণে কোণে অন্ধকারে। দুর্গাবতীর সারা শরীরে সিক্ত ঘাগরা ও বক্ষবাস চেপে বসেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনী ধরে। দাঁতে দাঁত লাগে। কোনরকমে বসন পরিবর্তন করতে ঠাণ্ডা একটু কমে। শিলাহাদী ওকে একটা চাদর জড়িয়ে, বিছানার দিকে নিয়ে যায়। নরম শয্যা।

বিকেল পার করে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত পার করে পরের দিন সকালে শিলাহাদী কুঠরী থেকে বের হয়ে আসে। পরে দাসী এসে ডাকে—মালকিন উঠুন, বলে। দুর্গাবতী নামে। ওদের খবর কেবল দাস-দাসীই জানে। সিঁড়ির পাশে রাত জেগে কাটিয়েছে সে।

রাত গেল, দিন এল। সবাই কাজে মগ্ন হয় আবার। বর্ষণ মুখর অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা রৌদ্র তপ্ত যেমনই দিন হোক না কেন, কিষাণকে কর্ষণে ব্যস্ত হতেই হয় বাঁচার তাগিদে। প্রজা রাজা সবারই মরণ বাঁচন তার হাতেই যে।

কেল্লার বাসিন্দারাও বাঁচার আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে সারা বছর। এখানে আছে কয়েকটি পুষ্করিণী। সবাই জল নেয়। কুয়াও আছে অনেক। প্রাসাদের ভিতরের কুয়া অন্তঃপুরের প্রাণীদেরই জলের চাহিদা মিটায়। বর্ষায় এরা সকলেই ফুলে-ফেঁপে ওঠে। জলে ভরে যায়।

শাক-সব্জীর বাগিচা সবুজ রঙ ধরে। আর রাজ উদ্যান? সেখানেও নানা ফুল গাছের পরিচর্যা শুরু হয়। রাজার প্রিয় সাগর তালকে ঘিরে যে ফুলের চারা লাগানো হয়েছিল, বর্ষায় তারা সতেজ হয়। মহলের অন্তঃপুরের আঙিনায় ফুলের গাছ ময়ূরের মতো পেখম ধরে। যুঁই ফুলের লতাগুলি খুশীতে লকলক করে।

—এদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে দেওয়ালের পাথর খসে গেছে।

রাজ কর্মচারী রাজার সামনে এসে খবর দেয়।

—বৃষ্টি একটু কমলেই, সারানোর ব্যবস্থা করবে। সুরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। ফেলে রাখা যায় না।

রাজ কর্মচারী আদেশ শুনে চলে যায়।

শিলাহাদীর মনে চিন্তার উদয় হয়। কি করে দেওয়ালের পাথর খসেছে! কোন বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্র করেনিতো! শত্রুর কোন লোকতো নেই দুর্গে! না, বৃষ্টির জলের তোড়ে হয়তো এমন হয়েছে! পাথরের বাঁধন ঢিলে হয়ে থাকবে।

দুর্ভাবনা রাজাকে অস্থির করে তোলে বৈকি ; রায়সেন কেল্লার উপর তীক্ষ্ণ নজর সবারই আছে। সুরক্ষার কথা চিন্তা করে, শিলাহাদী তখনই অশ্বারোহী হয়ে প্রাসাদ থেকে বের হন। একজন অনুচরকেও পিছনে আসতে বলেন। শিলাহাদী ঘোড়া থেকে নেমে, দেওয়ালের গা ধরে দাঁড়ান। কয়েকটা পাথরের সাহায্যে

ওখানে উঠে দাঁড়ান। ...নীচে, সিধা খাড়াই। না, দেওয়ালের অন্য সব জায়গা মজবুত। অতি বৃষ্টির ফলেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

রাজ কর্মচারীকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে, অশ্বারূঢ় হন। কিন্তু মহলে ফেরেন না। আরও এগিয়ে চলেন অন্য দিকে—নিজের চোখে সব দেখতে।

স্থানে স্থানে প্রহরী মোতায়েন। রাজাকে দেখে সম্মান দেখায়। মজুর কাজ করছে। বাগানে আম, পেয়ারার চারা লাগানো হয়েছে। এই সময়টাই প্রশস্ত এর জন্য। বুনো কুল, বাবলায় ভরে গেছে চারদিক।

ঘোড়ার লাগামের মুখ ঘোরায় শিলাহাদী দূরে সাগব তালের দিকে। যেখানে নূতন ফুলের বাগান তৈরী হচ্ছে, এক নজরে দেখে নিয়ে এগোন।

হঠাৎ, মেঘে ঢাকা আকাশের বুক চিরে, সূর্যের আলো কেল্লার উপর শুভ্রতার ধারা ছড়িয়ে দেয়। গম্বুজেব উপর এক জোড়া চড়ুই ডানা ঝাপটিয়ে জল ঝাড়ছে। রোদও উপভোগ করছে তারা। মিষ্টি রোদ উঠেছে বর্ষণের পর। কার না ভাল লাগে। শিলাহাদীর ঘোড়াও যেন রোদের পরশে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হঠাৎ মস্ত চালে চলতে শুরু করে। এতক্ষণের ঢিলে ভাব কেটে গেছে তার। শিলাহাদীরও রোদ ভাল লাগে।

১০

বর্ষা শেষ। হেমন্তর আহ্বান গাছপালায়। শিউলী মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক আধ ফোঁটা শিশির বিন্দু ফসলের গায়ে চিক্ চিক্ করছে। ছোট ছোট গাছে পাতার আসর বসেছে—যেন মুকুলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

কৃষক তৈরী। হল-কর্ষণ পর্ব শুরু। বিদিশা থেকে উজ্জয়িনী। মালবের কালো মাটিতে মানিকের আধার। সোনা ফলা জমীন। ফসলের ভাণ্ডার, শিলাহাদী রায়সেন, বিদিশার আশেপাশে খবর নেয়। ভাল ফসল মানে ভাল কর আদায়। সেই সম্রাট অশোকের আমল থেকে, গ্রামের মোড়ল যেমন ভাবে কর আদায়ের তদারকী করে আসছে, আজও চালু আছে সেই ব্যবস্থা। শিলাহাদীর কাছে খবর আসে দুর দুরান্ত থেকে।

বিদিশায় রাজকর্মচারী আছে। খবর পাঠায়—বীজ বোনার কাজ ভালভাবেই চলছে। শিলাহাদীর কাছে আবেদন করে গেছে, একবার পায়ের ধুলো দিতে। উদয়পুরায় নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে।

শিলাহাদীর মাথায় তরঙ্গ বয়। দুর্গাবতী কয়েকবার সাঁচী দর্শন করার কথা বলেছে। একটু শীত পড়ুক তারপর যাবে। সাঁচীর পাহাড়ের মাথা

থেকে, রাতের অন্ধকারে বিদিশার বাতির মিটি মিটি আলোর মেলা চোখে পড়ে। শিলাহাদীর অশান্ত জীবনের দুই এক রাত্রি সাঁচীর পাহাড়ের পাদদেশে, জঙ্গলের মাঝে কেটেছে। চোখ বুজলে বুদ্ধের তপস্যারত মূর্তি ভেসে ওঠে। চারদিকে শান্তির অমৃত বাণী উচ্চারিত হচ্ছে যেন।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে, দুর্গাবতীকে কাছে টেনে নেয় শিলাহাদী। সোহাগ ভরে বলে—তোমায় যেন কেমন উদাস দেখাচ্ছে। কথাটা বলবো বলবো করে বলা হয়নি।

দুর্গাবতী হঠাৎ এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এমন কথা কেন বলছে শিলাহাদা। কয়েকদিন ধরে মেবারের কথা বারবার মনে হয়েছে। মুখে প্রকাশ করেনি। মন খারাপ করে কি লাভ? থাকতে তো হবে এখানেই। অন্ধকারে চুপ করে থাকে।

—কিছু বলছো না কেন?

—কি বলবো।

—তোমার গলা কেমন যেন শুকনো।

একটু খিল খিল শব্দ। শিহরণ তোলে শিলাহাদীর বুকে

—মন উদাস হলে কি করবেন?

—তা'হলে, বলে, শিলাহাদী ওকে ধরে জোরে চাপ দেয়।

—উঃ, দম বন্ধ হয়ে যাবে যে—

শিলাহাদী হাতের চাপ আলগা করে।

—তুমি একবার সাঁচীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে না?

—হাঁ। সেতো কবে। গ্রীষ্ম পার করে বর্ষা, তারপর শীত এসে পড়েছে। আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম।

—যদি বলি, সে জায়গা দেখতে যাবে?

—সত্যি?

উত্তেজনায়, দুর্গাবতী অন্ধকারে, কাত হয়ে, পতির বুকে মাথা রেখে জবাব দেয়। হাতের কঙ্কণে একটু টোকা লাগে। কিণি কিণি শব্দ মধুর শোনায়। গলার চন্দ্রহার শূন্যে দোদুল্যমান। দুর্গাবতীর মনও দুলছে স্বামীর বাকি কথা শোনার জন্য।

—হাঁ, আমার রাণী।...কাল, পরশু।...যেদিন বলবে। যাত্রা করবো।

এ কথা শুনে, দুর্গাবতীর মন আনন্দে ভরে যায়।

—পরশু পূর্ণিমা। কাজেই—

—কাজেই আর কি? কালই রওনা হবো। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে সাঁচী দেখবো। আপাততঃ এই চাঁদবদনীর মায়ার খেলায় ডুবে যাই—বলে, পাশ বদলায় শিলাহাদী দুর্গাবতীর দিকে।

কয়েকদিনের জন্য শিলাহাদী কেল্লা ছেড়ে যাবে। যাবার আগে মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীদের উপযুক্ত নির্দেশ দিতে হবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার।

রাজা নয় শুধু, রাণীও যাবেন। সব রকম আয়োজন পূর্ণ করতে হবে। সাঁচী অনেক দূর। রাজা রাণী যাবেন হাতিতে। হাতির হাওদার সরঞ্জাম হওয়া চাই রাজকীয়। সব চেয়ে সুন্দর ঘোড়াও যাবে—যাতে শিলাহাদী প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। অনেক উটও যাবে সঙ্গে নানা জিনিস পত্র সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। দুর্গাবতী রাজপুতনা দুহিতা। উট রাজস্থানে সবচেয়ে প্রচলিত বাহন।

সব রকম ব্যবস্থা মন্ত্রী নিজে করছেন। উনি নিজে যাচ্ছেন না। কোন গণ্ডগোল না হয়, তাই সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন। কয়েক শত সৈন্য যাবে। অশ্বারোহীও থাকবে। আরও থাকবে অনেক লোক লস্কর বহু প্রকারের কাজকর্ম করার জন্য।

অশ্বারোহী দূত যাবে আগে—প্রত্যুষে খবর নিয়ে, যাতে স্থানীয় সর্দাররা রাজার জন্য সব রকম আয়োজন করে রাখে।

হাতির হাওদার উপর ছোট কাঠের ঘেরা। তার উপর ও চতুর্দিকে সুন্দর ঝালর। ভিতরে তুলোর নরম গদী। এর উপর রূপবতী দুর্গাবতী। হাতি হেলে দুলে চলেছে। মাহুত হৈ হৈ আওয়াজ করছে মাঝে মাঝে। গলার ঘণ্টা থেকে টুং টুং শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যায়। শিলাহদী অন্য হাতিতে চলেছে। আগে আগে। অশ্বারোহীর দল সম্মুখে ও পশ্চাতে।

নবীন সূর্যের আলোতে ঝলমলে সকাল। ধুলো উড়ছে হালকা হাওয়ায়। দুর্গাবতী যাত্রার আনন্দ উপভোগ করছে। বিকেলের দিকে সাঁচীর পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছোয় তারা।

হাতি হতে নামার অনেক আগেই দুর্গাবতী হাওদায় বসে ঝালরের ফাঁক দিয়ে সাঁচীর স্তূপের দৃশ্য দূর হতে দেখে নিয়েছে। কিন্তু যা দেখেছে সেটা স্তূপের চূড়ার একটু অংশ মাত্র। অনুমান করে এটাই সাঁচীর স্তূপ।

বিশাল এক আম গাছের নীচে হাতি দাঁড়ায়। কিন্তু দুর্গাবতীকে নামতে দেয়

না শিলাহাদী। ওর মনে অন্য চিন্তা। মাহুতকে, শুঁড় দিয়ে ওকে উপরে ওঠাতে বলে। মাহুত তাই করে। শিলাহাদী, দুর্গাবতীর সাথে কথা বলতে চায়।

—আমাদের যাত্রার পথ একটু পরিবর্তন করেছি। সাঁচীতে রাত্রি যাপন না করে, বিদিশাতে যাবো। অতীতে যে জায়গা থেকে সাঁচীর নির্মাণ কার্যের শুভারম্ভ হয়েছিল, আগে সেখানে যাবো।

দুর্গাবতী একটু মনঃক্ষুন্ন হয়। কিন্তু ঘেরা টোপের ভিতর থেকে কিছু বলে না।

—কার্ত্তিক পূর্ণিমা। এই সময় বিদিশার কাছে মেলা বসে। আগে সেখানে যাবো। ফেরার পথে সাঁচী দেখবো।

মেলার কথা শুনে দুর্গাবতী খুশী হয়। হালকা হাসির সাথে সম্মতি জানায় শিলাহাদীকে।

ফের যাত্রা শুরু হয়। আগে বিদিশা।

আসলে অল্প সৈন্য নিয়ে এসেছে শিলাহাদী। নিরাপদ নয় এমন জায়গায় রাত কাটানো ঠিক নয়। বিপদ বলে আসে না। সতর্ক হওয়া জরুরী।

বেতবা নদী পার করতে একটু সময় লাগে। বেতবা—পুরাণে যাকে বেত্রবতী বলা হয়েছে। পুণ্যসলিলা, অবগাহনে পুণ্য সঞ্চয় হয়। হাতি সাঁতার দিয়ে ওপারে যায়। উটও তাই। বাকি সবাই সংকীর্ণ কাঠের পুলের উপর দিয়ে নদী পার হয়।

সাঁঝের কোলে বিদিশার রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছোয় শিলাহাদী। দিনভর চলেছে। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না।···বিদিশার পাশেই বেসনগর। লাগোয়া। ওখানে মেলা বসেছে। বেতবা নদীর ওধারে। নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে অজানা দেশে।

একটু বিশ্রাম নেবে, জলযোগ সারবে, তারপর বেসনগর যাবে ওরা।

—কাহিল হয়ে পড়নিতো? একটু আরাম কর। তারপর ওখানে যাবো।

—কোথায়?

—যেখানে মেলা বসেছে।

বিস্মিতা দুর্গাবতী।

—মানে। মেলা এখানে নয়।

—না, না। কাছেই। বিদিশার লাগোয়া, অতীতে আর এক নগর ছিল বেসনগর। ওখানে যেতে খুব অসুবিধা হবে না। তুমি কি পরিশ্রান্ত?

দুর্গাবতী ভাবে, তাহলে শিলাহাদী বোধ হয় মেলায় যাবে না।

—না, না। আমি যাবো। রাজপুতানী আমি। এত সহজে হার মানবো না। হাতিতে তো আরামেই এসেছি। উট হলে, আরও ঠমক্ ঠমক্ করে চলতো। তালে তালে দুলতে হতো। রাজপুতনায় সবাই উটের ব্যবহারে অভ্যস্ত।

হাঃ হাঃ···শিলাহাদী হেসে ওঠে। দুর্গাবতীর উত্তর শুনে বোঝে, ও দমবার পাত্রী নয়।

দেরীতে বাসায় ফেরা পাখি জানালার পাশ হতে উড়ে যায়। ভয় পেয়েছে শিলাহাদীর হাসির দমকে।

—তা জানিগো রাজপুতানী। তবু তোমায় পাল্কীতে নিয়ে যাবো মেলায়। আমি অশ্বারোহী হয়ে আগে, পিছনে তুমি। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। বিদিশার শেষপ্রান্তে, নদীর ওপারে বেসনগর।

দুর্গাবতী পোষাক পরিবর্তন করে। মাথায় ফুলের স্তবক সাজাতে ভুল করে না। চোখের কোণে কাজলের রেখার টান দেয় সরু করে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। চারিদিকে চাঁদের আলোর বন্যা। মোহময় পরিবেশ। অন্ধকার কেবল গাছের নীচে। বাকি চারিদিকে আলোর বাহার। উন্মুক্ত আকাশের শুভ্র চাঁদের ছটা যেন সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে বেসনগরে। এই সেই বেসনগর বৌদ্ধযুগে যাকে বৈসানগরা নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

মেলা ভাঙার মুখে। তবু যখন প্রজারা শুনেছে যে রায়সেন দুর্গের রাজা আসছেন, তাই সন্ধ্যার পর মশাল জ্বালিয়ে ধুনি প্রজ্জলিত রেখেছে। অধিকাংশ দোকানীরা চলে গেছে। কিছু এখনও রয়েছে। মাটির খেলনা। কাপড়চোপড়। দুর্গাবতী কয়েকটি দোকানে যায়।

...প্রচলিত কিংবদন্তী—রাজা রুকমঙ্গদ বেসনগরের পত্তন করেন। রাজা নাকি নিজ পত্নীকে অবহেলা করে অপরূপা নর্তকী, বিশ্বমোহনীর মায়া জালে আবদ্ধ হন। তার জন্য নওলক্ষা বাগান তৈরী করেন। নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী, তাই বাগানের নাম নওলক্ষা। দুনিয়ার তামাম ফুল দিয়ে বাগানকে সাজান। নূতন নগরের নামকরণ হয় বিশ্বনগর—নর্তকীর নামে। বিশ্বনগরই কালক্রমে বৈসানগরে পরিণত হয়।

...এই মেলা রুকমঙ্গদ একাদশীর নামে বিখ্যাত। লোকেরা জানে না রাজার সম্মানে এই মেলা···না, যে রাণীকে অবহেলা করতো রাজা, তার সম্মানের জন্য। দূর দূর হতে লোক আসে। কাছে পিঠে লোকালয় নেই। বেসনগর আজ পরিত্যক্ত।

ধ্বংস স্তূপ চতুর্দিকে। ভগ্নাবশেষ। যেন কোন মত্ত দানব মুগুর দিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করেছে।

...অথচ এই বেসনগরে একদা সবচেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস ছিল। আর ছিল প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র, বৌদ্ধযুগে। তারও আগে। ...যে সাঁচীর নাম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত, তার পত্তন এখান হতেই হয়েছে।

শিলাহাদী, দুর্গাবতীকে নিয়ে এক উঁচু স্তম্ভের নীচে এনে দাঁড় করায়। চাঁদের কিরণে চারিদিক ঝলমল করছে। স্তম্ভের মাথায় অদ্ভুত মকর মূর্তি। মুখ কুমিরের মত, কিন্তু লেজ বড় আকারের মাছের লেজের মত। দুর্গাবতী মুখের উপর হতে ওড়না সরিয়ে দেখতে থাকে গভীর বিস্ময়ে, পলক না ফেলে।

—জান, এই স্তম্ভটি সম্রাট অশোকের সময়ের তৈরী। হাজারো বছর পূর্বের কথা। ...অশোক তখনও সম্রাট হন নি। পিতা বিম্বিসারের নির্দেশে উজ্জয়িনী যাচ্ছিলেন, ওখানের শাসক রূপে। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে যাওয়ার পথে বেসনগর পথিমধ্যে পড়ে। বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস ছিল। দূর দূর হতে লোক কেনা কাটা করতে আসতো। দূরদূরান্তে মাল রপ্তানী হতো।

যুবরাজ অশোক এই নগরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যবসায়ীরা যুবরাজের সম্মানে আমোদ প্রমোদের আয়োজন করে। নৃত্য গীতের আসর বসে গভীর রাতে।

কিন্তু অপরাহ্নে উদ্যানে এক সুন্দরী যুবতীর দর্শনে যুবরাজের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পরে ওর নাম জানতে পারেন তিনি। ...দেবী। হাঁ, দেবীর মতই সুন্দরী, অপরূপা। মনে দোলা লাগে। ভোজের উৎসব, কিন্তু মন ব্যাকুল। সুন্দরীর নয়ন বাণে বিদ্ধ। বিশ্বস্ত অনুচরের মারফৎ প্রস্তাব পাঠান ব্যবসায়ী পিতার নিকট। বিবাহের প্রস্তাব। এই সংবাদ রটনা হতে দেরী হয় না। বেসনগরবাসীর আনন্দ আর ধরে না। ...ভারতের ভবিষ্যত নৃপতির সঙ্গে বেসনগর দুহিতার পরিণয় হবে। দেবীর পিতা উৎসবের আয়োজন করেন। উজ্জয়িনী থেকে ফেরার পথে অশোক পত্নী কিন্তু বেসনগরে থেকে যান। পাটলীপুত্র যান না দেবী।

দুই নদীর সঙ্গমে বেসনগর। বেতবা ও বেস নদী তিন দিক ঘিরে রেখেছে। এখানে দুটি পাথর আছে। তাতে নাকি বিষ্ণুর পদ চিহ্নের ছাপ আছে। তাদের চরণ-পাদুকা বলে লোকে। ভক্তদের আনাগোনায় ব্যস্ততা সর্বত্র।

শিলাহাদী একটা করে মূর্তি দেখান আর চলতে থাকেন। ইতিপূর্বে বৌদ্ধ পূজারীদের কাছ থেকে জাতক কথার মত এসব কথা শুনেছে তিনি।

অশোক বার বার আসতেন বেসনগরে যেহেতু পত্নী দেবী এখানে থাকতেন। অবশ্য রাজ্য শাসনের খাতিরেও। বেসনগরের উন্নতি হতে থাকে। বাণিজ্য, ব্যবসায় ফুলে উঠে।

—কি সুন্দর।

এক বিশাল নারী মূর্তি। পাথরের, কিন্তু মূর্ত। রূপ ঠিকরে পড়ছে।

দুর্গাবতী অবাক হয়—এতবড় মূর্তির গড়ন দেখে। সাধারণ দেব-দেবীর মতন নয়। এক হাত কোমরে। অন্য হাত আগে বাড়ানো, তবে ভাঙা। কালের নিষ্ঠুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত। শাড়ীর নীচেও অন্তর্বাস—যা সচরাচর দেখা যায় না। নিতম্বের উপর পরিস্ফুট গহনার অপূর্ব বাহার। কোমর বিছার মত। শাড়ীর অংশ হাঁটুর নীচে নেমে এসেছে—সুন্দর পায়ের গোছ পর্যন্ত। গলায়, হাতে নানা প্রকারের গহনার ছড়াছড়ি। এ নাকি মায়াদেবীর মূর্তি। মায়াদেবী—বুদ্ধের মাতা।

অশোক পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধদেবের বাণীর রূপ দানে ব্রতী হন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চৈত্য বিহার বানান। বেসনগরেও ছোট ছোট বিহার স্থাপিত হয় ব্যবসায়ীদের সহায়তায়।

—এই যে ছোট ছোট স্তূপ দেখছো, এটিই বড় আকারের স্তূপ আর তার চতুর্দিকে পাথরের বেড়া তৈরী করা হয়েছে সাঁচীতে।—আপনি যে বললেন, সম্রাট অশোক এখানে থাকতেন না, অনেক দূরে থাকতেন। দুর্গাবতীর বিস্ময় জড়ান প্রশ্ন।

—ঠিকই। তবে সম্রাটতো। বিশাল রাজ্য ছিল। পাটলিপুত্রে অন্য রাণীরা ছিলেন। দেবী কিন্তু এখানেই থাকতেন। বেসনগরের বিত্তবান ব্যবসায়ীরা সাঁচীর স্তূপ তৈরী করতে আর্থিক সহয়তা করেন।

—সাঁচীর অতো স্তূপ উনি বানিয়েছিলেন, আসার পথে যা দূর হতে দেখলাম।

—না। যখন ওখানে যাবো, তখন তোমায় বলবো কারা বানিয়ে ছিলেন। সম্রাট অশোক যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তখন জৈন ধর্মের প্রভাবও ছিল খুব। সাধারণতঃ এই ধর্মের মধ্যে তফাৎ খুব বেশী নেই। ...ত্যাগ। ...মাংস ভোজন বর্জন। ...সন্ন্যাসী হয়ে চৈত্য বিহারে জীবন কাটানো। ...দু'ধর্মেরই প্রচারক ছিলেন। দূর দূর তাদের যেতে হতো। কিন্তু জৈন ধর্মের পুরো উপবাসী

হয়ে দিনপাত করা সবার পছন্দ হয় নি। হিন্দুরাই দুই ধর্মের অনুগামী হয়েছে। কিন্তু জৈন ধর্মের কঠোরতায়, অনেকে বুদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

...বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন ঐরূপ কঠোরতায় লোক দূরে সরে যাবে। তাই তিনি উপনিষদের অনেক বাণীকে গ্রহণ করেন—যার সাথে সাধারণ লোক পরিচিত ছিল। ...সংস্কৃত ভারতে মূল ভাষা। কিন্তু শিক্ষিত লোক ছাড়া সাধারণ লোক তা বুঝতে বা ব্যবহার করতে পাবতো না।...বুদ্ধদেব প্রাকৃত অর্থাৎ তখনকার দিনে চলতি ভাষায় ওঁর বাণী প্রচাব করেন। সাধারণ মানুষ একে গ্রহণ কবে। ···গরীব জনসাধাবণের জন্য পথিপার্শ্বে ধর্মশালা খোলেন। খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। গরু মোষের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন কবেন। ···পূর্বে এক নাগাড়ে কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ হয়। অশোকেব পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত আত্মহত্যা কবেন। হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দাক্ষিণাত্যে চলে যায়। কাজেই ক্ষুধার জ্বালা যে কি, তা বুঝে ছিলেন অশোক। ....বৌদ্ধ ধর্ম প্রচাবের জন্য দুনিয়ার অনেক দেশে দূত পাঠান। অনেক দেশ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে।

—এ সব কি বেসনগরে থেকে করতেন ? দুর্গাবতীর অবাক করা প্রশ্ন।

—না, না। পাটলিপুত্র থেকে। বেসনগবে কখনও কখনও আসতেন। তবে রাণী দেবীর গর্ভে অশোকের যে পুত্র-কন্যা হয় তাদের নাম মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা। অশোক তাদের সিংহলে পাঠান। তারা এই বেসনগর থেকেই সেখানে ধর্ম প্রচারে যায়—উজ্জয়িনী, গুজরাত হয়ে সমুদ্র পথে।

....দেবীও অশোকের থেকে পিছিয়ে ছিলেন না, যদিও তিনি পাটলিপুত্র যান নি, তবুও এখান হতেই স্বামীর অনুগামিনী হয়ে স্বামীর ইচ্ছামতোই কাজ করে গেছেন। যে অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর মনের পরিবর্তন আসে, তাঁর সাথে দেবীও কদমে কদম মিলিয়ে চলেছিলেন।

....সিংহল যাবার পূর্বে, দেবী বেসনগর হতে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে সাঁচীর বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে যান। বিহারের অধ্যক্ষের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করান। বুদ্ধের মর্মবাণীতে সিংহলের রাজা অভিভূত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

....প্রতি বৌদ্ধ বিহারে নেতার চয়ন হতো। প্রতিবছর একবার সারা দেশের বৌদ্ধ নেতারা পাটলিপুত্রে একত্রিত হতেন। বেসনগর হতেও প্রতিনিধি যেতেন আলোচনা সভায় ভাগ নিতে।

....দেবী বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করেন। বেসনগর ত্যাগ করে সাঁচীর চৈত্য বিহারে আশ্রয় নেন। যেখানে অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ছিলেন। উপাসনা

ও আরাধনা করেই দিন কাটাতেন। যদিও রমণীদের বৌদ্ধ বিহারে থাকা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু যেহেতু অশোক-পত্নী, তাও বৃদ্ধাবস্থা, তাই হয়তো অনুমতি পেয়ে থাকবেন। ভিক্ষুদের নারীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ ছিল।

...অশোকের মৃত্যুর পর, বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল দেখা দেয়। শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথের জীবন অকালে শেষ হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই রাজার মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ তনয় পুষ্যমিত্র। রাজা দুর্বল হলে যা হয়। গুপ্ত হত্যায় প্রাণত্যাগ করেন। মৌর্য্য বংশের এখানেই ইতি। কৌটিল্যের সতর্কতার প্রণালী বৃহদ্রথকে বাঁচাতে পারে নি।

....মৌর্য বংশের বিখ্যাত মন্ত্রী কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্গ স্থাপনার রূপরেখা ও পাটলিপুত্র নগরের বিস্তারিত নক্সা তৈরী করেন। মগধ সম্রাটদের প্রাসাদ, দুর্গের একপাশে স্থান পায় যাতে হঠাৎ করে ওখানে কেউ ধেয়ে না আসে। ...বিস্তৃত উদ্যান। ....বাজার। ....ঔষধালয়। স্থানে স্থানে পোষা ময়ূর আর ময়নার মধুর তান পাটলিপুত্র নগরবাসীর মনকে মাতিয়ে রাখতো। পথেঘাটে জঞ্জাল ফেলা নিষেধ ছিল। অগ্নি প্রতিরোধের ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। পথের ধারে শত শত মাটির আধারে জল থাকতো। কাঠের গৃহে আগুন লাগার আশংকা থাকতো—তাই প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

...কৌটিল্য মৌর্য্য রাজাদের জন্য দুর্গের ভিতর যে প্রাসাদের পরিকল্পনা করেন—তা' অপূর্ব। বেদ, পুরাণে যে চার প্রকারের দুর্গের উল্লেখ আছে। কৌটিল্য তার উপর জোর দেন। ....জল দ্বারা দুর্গকে রক্ষা করা। ...মগধ রাজ্যে জলের অভাব ছিল না। গঙ্গা ও সোণ নদের সঙ্গমে পাটলি গ্রামকে বেছে নেন কৌটিল্য রাজধানী স্থাপনের জন্য। তীক্ষ্ণ মেধা কৌটিল্যের তিন আঙুলের মধ্যে নল খাগড়ার কলমে ফুটে ওঠে—নক্সায়।

...এত সতর্কতা আর নিপুণ দক্ষতা সহকারে যে দুর্গ মহল কৌটিল্য পরিকল্পনা করেন, তা আততায়ীর হাত থেকে শেষ মৌর্য্য সম্রাটকে বাঁচাতে পারেন নি। শত্রুর অনুপ্রবেশের কথা ভেবেছিলেন। ...কিন্তু প্রাসাদের ভিতরে গুপ্ত শত্রুর কৃপাণকে কি করে রোধ করা যাবে?

...মৌর্য্যদের অধিকার সমাপ্ত হয় পাটলিপুত্রে। শুরু হয় সুংগ বংশের জয়-যাত্রা। পুষ্যমিত্র সিংহাসনে বসেন। বহু বৌদ্ধ স্তূপ ভেঙ্গে দেন।.. সাঁচীর পাহাড় কেঁপে ওঠে। এখানেও হাত পড়ে। ভেঙ্গে ফেলেন স্তূপের ছত্রী।...হিন্দু ধর্মের উত্থানের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সুদূর সিন্ধুনদ পর্যন্ত অশ্ব পাঠান। পুত্র

অগ্নিমিত্রের ছেলে বসুমিত্র সঙ্গে যায়। অগ্নিমিত্র বেসনগরে থাকতেন। মালবের শাসনভার ছিল ওঁর উপর। কখনও কখনও উজ্জয়িনীতেও যেতেন।

...পিতা পুষ্যমিত্র দীর্ঘ ৩৬ বছর রাজত্ব করেন। ফলে, পুত্র অগ্নিমিত্র প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় সিংহাসনে বসেন। এই জন্যে রাণী হংসপাদিকার দুঃখের সীমা ছিল না। রাজাকে ভর্ৎসনা করেন। প্রৌঢ় রাজা বিদর্ভ রাজকন্যা মালবিকাকে বক্ষপাশে পাবার জন্য ব্যাকুল। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম নাট্যকাব্যে অমর হয়ে আছে প্রেম-বিরহ-যুদ্ধের বিষাদ ভরা সুর।

...সুংগ বংশের এক রাজা ভগভদ্রের রাজত্বকালে তক্ষশীলার গ্রীক সম্রাট এন্টিয়ালসিভাস, ওর রাজদূত ডিয়নের পুত্র হেলিডোরাসকে বেসনগরে পাঠান। গ্রীক সন্তান বৈষ্ণব মতাবলম্বী হয়ে ওঠেন। বেসনগরে এক বিশাল স্তম্ভের স্থাপনা করেন তিনি আরাধ্য দেবতা বাসুদেবের সম্মানে।...অনেকে এই স্তম্ভকে গরুড় দরবাজা বলে থাকে। আবার হেলিডোরাস স্তম্ভ, খাম্বা বাবা নামেও খ্যাত অনেকের কাছে। ভগবান বাসুদেবের সম্মানে গরুড়ধ্বার তৈরী হয়। কিন্তু তার নামকরণ হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশী মতো। ভিন্ন মতের অভাব নেই এদেশে প্রাচীন কাল থেকেই।

...দীর্ঘ বত্রিশ বছরের শাসনে ভগভদ্র রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু ওঁর উত্তরাধিকারী দেবভূতি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। নারী দ্বারা পরিবৃত হয়ে দিনপাত করাই ওঁর কাম্য ছিল।—কবি বানভট্ট রাজার দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, কেমন করে এক নর্তকীর দ্বারা নিহত হন তিনি। রাণীর বেশ ধরে, ঐ চতুরা নর্তকী রাজার বক্ষলগ্না হয়ে দুর্বল মুহূর্তে তাঁর জীবনদীপ শেষ করে দেয় গুপ্ত ছুরিকার আঘাতে। রাজার মন্ত্রী বাসুদেব কহ্ব ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় এমন কাজ করে ঐ নর্তকী। কি পেয়েছিল ঐ রমণী এমন জঘন্য কাজের জন্য?

খাম্বার সামনে দাঁড়িয়ে শিলাহাদীর ঐতিহাসিকতার বর্ণনায় ডুবে গিয়েছিল দুর্গাবতী। শিলাহাদী একটু চুপ করে। দুর্গাবতীর তন্ময়তা ভাঙে।

—তাহলে সম্রাট অশোকের বংশধরের মত, সুংগ বংশও শেষ হয় আততায়ীর হাতে?

—হাঁ। আজ চলো, রাত হলো। কাল শোনাবো বাকি কথা বিদিশার মর্মবাণী। যদিও বেসনগর ও বিদিশার মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই, তবে একে কেন্দ্র করেই রাজ্যশাসন হতো। কিন্তু কয়েকশত বছর পর, বেসনগর ছেড়ে,

বিদিশাই শাসক শক্তির প্রধান দুর্গে পরিণত হয়। বেসনগর ক্রমে পুরো পরিত্যক্ত হয়।

—বেসনগর, অতীতের অন্য বহু নগরের মত রক্ষা কবচের বন্ধনীতে বাঁধা। ত্রিভুজ আকারের এই নগরও দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। শত্রু ও হিংস্র পশু, দু' থেকেই রক্ষা পাবে। বেসনদী হতে ছোট খাল কেটে আনা হয় নগরে বাগান ইত্যাদিতে জল সেচের জন্য। বোধহয় এই খালের জলই কোন সময়ে দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে বেসনগরবাসীর জন্য। হয়তো জলে জলাকার হয়ে গেছে নগর। বর্ষায়, বন্যায় প্লাবন বয়ে গেছে। নগর প্লাবিত হয়েছে। ডুবে গেছে সব কিছু।

গুপ্ত রাজাদের সময় মানুষ বেসনগরকে পরিত্যাগ করে, বেতবার অন্য তীরে চলে যায়। বিদিশার পত্তন হয়। নূতন জনপদ গড়ে ওঠে।

বেসনগর পিছনে ফেলে চলে আসে দুর্গাবতী। পাশে শিলাহাদী।

মনে পড়ছে কল্পদ্রুম প্রস্তরের ছবি। কল্প বৃক্ষের কথা। পাথরের বেদীর উপর কয়েক ফুট উচ্চ এক বৃক্ষ। বেসনগরবাসীরা একে দেবলোকের ভাগ্যবৃক্ষ বলে মানতো। বট বৃক্ষ। এর নীচে আছে ছোট ছোট গর্ত বিশেষ অর্থ সঞ্চয়ের জন্য। জলের ভাণ্ডারের জন্য ছোট ছোট আধার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকাঙ্খার বৃক্ষ আজ ভগ্ন, পরিত্যক্ত, আর বেসনগরবাসীর আশা মৃত।

—কোথায় রইলো কল্পনার কল্প বৃক্ষ। সব পিছনে পড়ে আছে। শুধু নেই মানুষ। একদিন ব্যস্ততায় মুখরিত ছিল এই নগর। গম গম করতো। মথুরা, কাশী থেকে উজ্জয়িনী যাওয়ার পথে প্রধান নগর ছিল বেসনগর। এখানের বড় বড় ধর্মশালায় পথিকরা বিশ্রাম নিত। ব্যবসায়ীদের অশ্বের জন্য থাকতো খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা। সব ব্যবস্থাই ছিল নিঃশুল্ক। আজ আর কিছুই নেই। কেবল শূন্যতা। খাঁ খাঁ করছে ভগ্ন স্তূপে শিলাহাদী আক্ষেপ করে।

দুর্গাবতী পাল্কীর ভিতর চুপসে গেছে। মেলায় যোগদানের আনন্দের বদলে, দুঃখ যেন ঘিরে ধরেছে ওকে। অশোক পত্নী দেবীর আদরের বেসনগর আজ জনশূন্য, পরিত্যক্ত।

১১

বিদিশাকে সব সময় রাজনৈতিক ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মগধ সম্রাটদের অধীনে বিদিশাকে থাকতে হয়েছে। পশ্চিমের শত্রুপ ও দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের রাজাদের অধীনতাও স্বীকার করতে হয়েছে।—সাতবাহন রাজা

সাতকারিণীর উল্লেখ সাঁচী স্তূপের দক্ষিণ দিকের প্রধান দ্বারে পাওয়া যায়।— শক্রপ রাজাদের মুদ্রা বিদিশায় পাওয়া গেছে।

নাগ বংশের রাজাদের অধিকারেও ছিল বিদিশা। কুষাণ রাজন্যবর্গের আধিপত্যকে খর্ব করে নাগ রাজারা আধিপত্য বিস্তার করে। নাগ রাজাদের মুদ্রাও বেসনগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে মিলেছে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, নাগ বংশের প্রসারকে রুদ্ধ করতে, ঐ নাগ রাজের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। সমুদ্রগুপ্ত অনেক উপজাতীয় দলকে বশে আনেন। এদের বাস ছিল বিদিশার সন্নিকটে। চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় মালব বিজয়ের ছাপ বিদিশার পাশে রেখে যান—বিখ্যাত উদয়গিরি গুহাতে। এখানে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু সবার মন্দির পাশাপাশি। সহিষ্ণুতার ছবি যেন বিদিশা।

মশাল জ্বালিয়ে বরকন্দাজ চলেছে আগে আগে। পিছনে শিলাহাদী দুর্গাবতীকে নিয়ে আস্তে করে পাথরের দরজায় পা রাখে উদয়গিরিব গুহা মন্দিরে। ভিতরে অন্ধকাব। চামচিকের ভিড়। অনেক গুহা পাশাপাশি।

পাহাড়-কাটা মূর্তির কারুকার্য দেখে অবাক হয় দুর্গাবতী। নাগ শয্যায় বিষ্ণু যেন জীবন্ত। চন্দ্রগুপ্ত গুহার দুই পাশে দ্বারপাল। বিষ্ণু ও মহিষমর্দ্দিনীর মূর্তি। গঙ্গাকে ধরিত্রীতে আনাব জন্য পুরুষাকার প্রতিমূর্তি ভগীরথের বিশাল দেওয়াল চিত্র। প্রাণবন্ত।

উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের, উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কালিদাস বিদিশার ভ্রমণ সাঙ্গ করে, তার উচ্ছ্বাস মেঘদূত কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন। বিদিশার নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ। কবিকণ্ঠ বর্ণনার বাহারে মুখর।

বিদিশার নামাকরণের নামাবলী অন্তহীন।...রাজা ভিলুর নামে ভিলসা। আদিবাসী রাজার নামের অপভ্রংশ।...রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের মন্ত্রী বাচস্পতি সূর্য মন্দির, ভিলস্বামীন স্থাপন করেন। এর অপভ্রংশও ভিলসা। সম্রাট ইলতুতমিস এই মন্দিরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে।—ভিলসা, বিদিশায় পরিবর্তিত হয়'—কৌটিল্য একে বলেন দশনা—কালিদাসও তাই বলে অভিহিত করেন। ওঁর রঘুবংশতে ঐ নামের উল্লেখ আছে।—বানভট্টের অমর সৃষ্টি কাদম্বরী বিদিশার প্রশংসায় ভরা।

কলচুরী রাজাদের অধীনেও ছিল বিদিশা। এই বংশের এক রাজা বুধরাজ, বিদিশা থেকে সনদ জারি করেন। মালবের রাজধানী হয়তো কোন এক সময় বিদিশায় ছিল। গুপ্ত বংশের শেষ দুর্বল রাজার কাছ থেকে বুধরাজ বিদিশা কেড়ে নেন। কিন্তু চালুক্যরাজ মঙ্গলসা বুধরাজকে পরাস্ত করেন।

বেসনগর ও ভিলসা। পাশাপাশি জনপদ গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের এই ক্ষণে. বেসনগর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। যারা বেঁচে ছিল, বিদিশায় গিয়ে জড়ো হয়। বেসনগর মৃত নগরীতে পরিণত হয়। আর জীবনের স্পন্দন বিদিশায় বাড়তে থাকে দিন দিন।

চান্দেল রাজা ধঙ্গের, যিনি খাজুরাহের মন্দির স্থাপনার পত্তন করেন, রাজ্য সীমা প্রসারিত হয় গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত। বিদিশা ওঁর সাঁড়াশির মত রাজ্যের পরিধীতে পড়ে। চান্দেল রাজপুতকে পরমার রাজা দ্বিতীয় সিয়াকা পরাস্ত করে মালব বিজয় সম্পূর্ণ করেন। দক্ষিণে তাপ্তি ও পূর্বে বিদিশা পর্যন্ত তার রাজ্যের সীমা বেড়ে যায়। সিয়াকার পুত্র সিন্ধুরাজ নর্মদার তীর হতে চালুক্য রাজাদের হটিয়ে দেন। সিন্ধুরাজের বিখ্যাত পুত্র রাজা ভোজ মালবের গদীতে বসেন। ধারওয়ারে তার রাজধানী স্থাপিত হয়। বিশাল কেল্লা বানানো হয়। রাজা ভোজের পুত্র উদয়াদিত্য পিতার পরাজয়ের পরও বিদিশাকে অধানে রাখতে সমর্থ হন।

বিদিশার রাজপ্রাসাদে, এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুখ হতে বিদিশার মর্মবাণী শুনছেন শিলাহাদী। চিকের অন্তরালে দুর্গাবতী তন্ময়। শিলাহাদী বিদিশার বর্তমান শাসক। বিদিশার গৌরবময় অতীতের কাহিনী শুনে মুগ্ধ সে। গতকাল বেসনগরের আশ্চর্যজনক রূপ দেখেছে চাঁদের আলোয়। আজ উদয়গিরি গুহায় গুপ্ত রাজাদের ধর্ম সহিষ্ণুতার ছাপ দেখেছে। সমধর্মীয়তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাহাড়ের বুক কেটে সূক্ষ্ম শিল্প সৃষ্টি। বিস্ময়ে ভরা।

পরমার রাজাদের কীর্তি ছড়িয়ে আছে গৈরাসপুর ও উদয়পুরায়।

বৌদ্ধ ভিক্ষু চলে গেছে। দুর্গাবতী চুপ। শিলাহাদী স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন।

—কাল তোমায় গৈরাসপুর নিয়ে যাবো। তারপর উদয়পুরে যাবো—রাজা ভোজের বংশধরের তৈরী মন্দির দেখতে। আজ বিশ্রাম কর। প্রত্যুষে রওনা হবো।

প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এসে, বিদিশা নগরের মাঝে এসে দাঁড়ায় শিলাহাদী। প্রজারা ওকে দেখে সম্মান জানায়। নগরের বুকে ছোট পাহাড়ের টিলা। একদিকে দারুণ খাড়াই।

শিলাহাদী এগোয়। বরকন্দাজরাও সাথে সাথে চলেছে। টিলার উপর পৌছায় শিলাহাদী। ....বৌদ্ধ যুগের এক ভগ্ন স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ....কিংবদন্তী আছে, রাজ রুকমঙ্গদের তাঁর বিখ্যাত সাদা ঘোড়া, যার কান ছিল:

কালো, এই টিলার ঘোড়াশালে থাকতো। স্তম্ভের পাশে জলের ভাণ্ডার ছিল ঘোড়ার জন্য। ওটাকে লোকে পানি-কা-কুণ্ড বলে।

টিলার মাথায় সেখ জালাল চিস্তির সমাধি। লোহাঙ্গী পীরের দরগায় ভক্তি অর্পণ করে লোকে।

বিদিশা নগরী প্রাচীর বেষ্টিত। বেসনগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাথর এনে দেওয়াল তৈরী হয়েছে। ...কারণ, এখানের চৌকোণা পাথর বেসনগরেও দেখা গেছে। নগর থেকে বের হওয়ার জন্য তিনটে ফটক আছে। পশ্চিমে বেস ফটক। দক্ষিণে রায়সেন ফটক। পূর্বের ফটক দিয়ে কাশীর পথে যাওয়া যায়।

সকালে শিলাহাদী গৈরাসপুরের পথে যাত্রা করে।

দূর হতে পাহাড় আর তার বুকের জঙ্গল চোখে পড়ে। যত নিকটবর্ত্তী হতে থাকে, দুর্গাবতীর বিস্ময় বাড়তে থাকে। পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল মন্দির।...গবাক্ষে যেন উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রেয়সী পূজার অর্ঘ্য নিয়ে অপেক্ষামানা। রাজাও মন্দির স্থাপনের সময় দিনরাত কাটিয়েছেন এখানে।

মন্দির, বজ্র মঠ, আলাদা আলাদা ভাবে অবস্থান করছে। মন্দিরে যদিও জৈন মূর্তি আছে এখন ,কিন্তু অতীতে এটা ছিল হিন্দু মন্দির। এর প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি।...পশ্চিমে গণেশ আর শিব। পশ্চাদ্দেশে শিব ও বিষ্ণু, দক্ষিণে নৃসিংহ ও কালীর মূর্তি।...মন্দিরের সামনে বিশাল ষোল থামের সভাভবন। ভক্তগণ ভীড় করতো ওখানে।

মালাদেবীর মন্দির সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষক। দুই পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। বহুদূর হতে নজরে পড়ে।...কারুশিল্পের কারিগরি বিছিয়ে রয়েছে প্রতিটি দেওয়াল গাত্রে। গবাক্ষ বাহারের। অপূর্বভাবে চিত্রিত।

অনেক মন্দির ভগ্ন। শিব মন্দিরের প্রবেশ পথে হিন্দোলা তোরণ অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দোলের অর্থ ঝুলা—দোলনা। দুটি থামে আটকানো। চিত্রকর খোদাই করে মাছ, কচ্ছপ...বুদ্ধের সুন্দর মূর্তি বানিয়েছে। একদিকে দশ অবতার তোরণ আছে। কিন্তু ভিতরে মন্দির লুপ্ত। মুখর মন্দির প্রাঙ্গন আজ মূক।

শিল্পী পাথরের বুক কেটে বিশাখা, অর্থাৎ বৃক্ষ পরীর মূর্তির অপূর্ব রূপ দিয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পীরা যে রূপ নারীমূর্তি সৃষ্টি করে, এটা তা থেকে ভিন্ন।

....এই ত্রি-ভঙ্গিমা মূর্তি শাল ভঞ্জিকা নামে খ্যাত। চোখ আর ঠোঁটে হাসির

বন্যা।....বক্ষ থেকে নিতম্ব, তার নীচে অন্তর্বাসের কারুকার্য অপরূপ। সারা শরীরে হাসি ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না।

দুর্গাবতীর বিস্ফারিত চোখে অতীতের ছবি ধরা—শিল্পীর কল্পনার নারী। কে ছিল এমন সুন্দর মায়া-মনোহারিণী হাসির অধিকারিণী ?

নিকটে, সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে শিলাহাদী দুর্গাবতীকে ডাকে। শান্ত পরিবেশ। অল্প হাওয়ার দোলা। রাত্রি নামছে।

—আজ এখানেই বিশ্রাম করি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে গৌরবময় মন্দির সৌধ বানিয়েছেন, তার পাদদেশে রাত কাটিয়ে সকালে উদয়পুর যাত্রা করবো। শিলাহাদী দুর্গাবতীকে জানায়।

উদয়পুরে এসে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির দর্শন করে মন ভরে গেছে দুর্গাবতীর। মন্দিরের গর্ভগৃহে বিগ্রহ শিব। কণ্ঠ তাঁর বিষের আধার—নীলবর্ণ তাই তিনি দেবাদিদেব নীলকণ্ঠেশ্বর। রাজা ভোজের পুত্র উদয়াদিত্য এই মন্দির স্থাপন করেন। উঁচু বেদীর উপর মন্দির। চারকোণে তার ছোট ছোট চার মন্দির। পাশের পাহাড় থেকে কেটে আনা লাল রঙের পাথরের তৈরী মন্দিরের গড়ন সাধারণতঃ যেমন দেখা যায় তেমন নয়।.. .অনেকটা আর্য্য স্থাপত্যের অনুকরণে গঠিত.... আবার অলঙ্করণে কিছুটা দাক্ষিণাত্যের কারুকার্যের ধরন দেখা যায়। কলচুরী রাজা গঙ্গদেবের মালব অধিকারের ফলে কোন স্থপতি হয়তো ধারওয়ার রাজ্যে থেকে যায়। পরে উদয়াদিত্যকে সহায়তা করে এই মন্দির নির্মাণে। মন্দির চূড়ায় অদ্ভুত মূর্তি আছে। লোকে বলে স্থপতির প্রতিমূর্তি। বিশ বছর লাগে মন্দির তৈরী করতে। প্রধান মন্দির সংলগ্ন মোট একটি মন্দির ও বেদীর অংশ মহম্মদ তুঘলক ভেঙ্গে মসজিদ বানায় তার পাশে। মন্দিরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

১২

কয়েকদিন পর, এক রাতে শিলাহাদী বিদিশায় ফিরে আসে। দুর্গাবতী একটু কাহিল হয়েছে—কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত যাত্রা করে। শিলাহাদী ওর অবস্থা অনুমান করে।

—একদিনের পূর্ণ বিশ্রাম। তুমি ভাল করে স্নান করে, খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। কাল ফেরা যাবে। সাঁচী যাবো। তারপর রায়সেনের পথ ধরবো। আজ বিশ্রাম করো, চাঙ্গা হও।

—আর আপনি ?

—আমি ততক্ষণে একটু রাজকার্য করি। যখন এখানে এসেছি, তার সদব্যবহার করি।

—আপনি বিশ্রাম নেবেন না।

—রাজার কি অবসর আছে? রাজ ঐশ্বর্যের সাথে বিপদও গুঁটি গুঁটি এগোয়, বুঝলে রাণী। দুর্গাবতী গাল ধরে টিপে দেয় ও। সোহাগে চোখ বন্ধ করে নেয় দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী মনে কষ্ট পায় শিলাহাদীর কথায়। মুখে কিছু বলে না। সত্যই তো রাজার বিশ্রামের অবসর কোথায়? নিজের পিতাকেও তো দেখেছে। কি কঠোর জীবন সংগ্রাম!

শিলাহাদী প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যায়। দুর্গাবতী ঘোমটার ভিতর দিয়ে দেখে। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে, অলিন্দে দাঁড়িয়ে বিদিশার শোভা দেখতে থাকে। স্নানের কথা ভুলে যায়।

রোদ ঝল্‌মল্‌ করছে। লোহাঙ্গী পীরের পাহাড় ছায়া মেলেছে নীচের দিকে। কয়েকটা পায়রা উড়ছে পীরের সমাধি ক্ষেত্রে। হঠাৎ রায়সেনের কথা মনে পড়ে। মাত্র কয়েকদিন হলো ওখান থেকে বের হয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু মনে হয় যেন কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে!

—মহারাণী, আসুন স্নান করবেন না?

চাকরাণীর প্রশ্নে ভাবনায় ছেদ পড়ে। মাথা নাড়ে দুর্গাবতী। না। ফের ধীরে ধীরে এসে, বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

—শরীরটা ঠিক সুবিধার নয়।

—আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি হাত পা টিপে দিচ্ছি। পথের ধকল বলে কথা। একটু আরাম করুন, তারপর না হয় স্নান করবেন।

দুর্গাবতীর মসৃণ, সুডৌল পা কোলে নিয়ে, চাকরাণী টিপতে থাকে। চন্দন মালিশ করে। দুর্গাবতীর চোখ বুজে আসে আমেজে।

১৩

রাত্রির তখনও ঘুম ভাঙেনি যখন শিলাহাদীরা বিদিশা ত্যাগ করে।

অতি কষ্টে উটের পিঠে বসে, শিলাহাদীর সাথে সাঁচীর স্তূপ নামক পাহাড়ে ওঠে। আসলে এই পরিত্যক্ত পাহাড় মহুয়া, সেগুন গাছের নিবিড় জঙ্গলে

ভরতি। বাইরে থেকে প্রায় দেখাই যায় না কেবল স্তূপ শীর্ষ ছাড়া। জঙ্গলাবৃত পথ। উপরে ওঠার মত পথের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

শিলাহাদী উদয়গিরির গুহা মন্দির থেকে একজন জ্ঞানী বৌদ্ধ ভিক্ষু সাথে করে এনেছে। ওঁর সাঁচীর স্তূপের ইতিবৃত্ত জানা। জানা সমসাময়িক ইতিহাসও— উত্থান পতন বৌদ্ধ ধর্মের। শিলাহাদী দুর্গাবতীকে সব বুঝিয়ে বলেন উনি ·

বুদ্ধদেব একাই বুদ্ধ ছিলেন না। বুদ্ধদেব বলতে গৌতম বুদ্ধকে বোঝায়। বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন হওয়ার পুর্বেও অনেকবার জন্ম পরিগ্রহ কবেন বুদ্ধদেব। হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞ ইত্যাদির জন্য সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করতে হতো। এর উপর ছিল নানা বিধি নিষেধের কঠিন বেড়া। তুলনায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ছিল সহজ সরল এবং জনমানস আকর্ষক। বৌদ্ধ ধর্মের উদারতা জনগণের মনে দাগ কাটে এবং বিপুল সংখ্যায় তারা এই ধর্ম গ্রহণ করে। অবশ্য নূতনেব প্রতি সবারই আকর্ষণ আবহমান কাল হতে চলে আসছে।

বৌদ্ধ ধর্মকে উদারতার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রধান কৃতিত্ব অশোকের প্রাপ্য। সারা ভারতে স্তূপ ও বৌদ্ধ বিহারে ভরিয়ে দেন তিনি। পরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি ভগবান হিসাবে পূজা করা শুরু হয়। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দুদের মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়, কিন্তু বুদ্ধদেবের মূর্তির আরাধনা হতে থাকে।

বেসনগর থেকে একেবারে নিকটে, সাঁচীর অনুচ্চ পাহাড় শীর্ষে, প্রথম স্তূপ স্থাপন করেন অশোক। এখানেই তাঁর শ্বশুরালয়। যদিও বৌদ্ধ ধর্মের নামে, এক নগণ্য সংঘম পুর্বেই এখানে কাজ করতো, অশোক তাকে গতিশীল করেন। স্থিতিশীল হয় তার অস্তিত্ব। প্রসার প্রচার আরও সচল হয়।

সাঁচীর স্তূপ, তিমি মাছের পীঠের মত আকার। ইটের তৈরী। চুনের পলেস্তরা। চ্যাপ্টা মাথার উপর ছাতা। ছত্রী চুনার পাথরের তৈরী। সুন্দর। মসৃণ।

শিলাহাদীর কানের কাছে ঘোমটার আড়ালে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলে দুর্গাবতী। চুনার পাথরের মানে কি জানতে চায়।

একটু হেসে ভিক্ষু বলেন—কাশীর কাছে চুনার পাহাড়। সেখান হতে আনা হয়েছে পাথর। আরও একটি স্তম্ভ অশোক এখানে স্থাপিত করেন। লাট বলে খ্যাত এটা। এর সারা গায়ে লিপিবদ্ধ নানা বাণী। স্তম্ভটির গা তেলের মত মসৃণ, অতুলনীয়। সাঁচীর মঠের কর্মধারার জন্য সতর্কতার বাণী লিপিবদ্ধ করেন অশোক। এত বড় স্তম্ভের জন্য পাথর, এত দূর হতে আনা কি দারুণ কঠিন কাজ? কোথায়

চুনার ? বিন্ধ্যাচলের বুকে। সাঁচী এত দূরে। শত শত বৃষ বাহিত লম্বা শকটে পাথর আনা হয়েছে এখানে।

মৌর্য্য বংশের পর, পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন সুংগ বংশের ব্রাহ্মণ তনয় পুষ্যমিত্র। উনি বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্য বিহার ভেঙ্গে ধূলিস্যাৎ করেন। সাঁচীও বাদ যায় না। স্তূপের ছত্রি ভূ-লুণ্ঠিত হয়।

কিন্তু মজার কথা, এই সুংগ বংশের পরবর্তী অন্য রাজারা আবার পুষ্যমিত্র দ্বারা ভগ্ন স্তূপের উপর নূতন করে স্তূপ তৈরী করেন। ঢেলে সাজানো হয় সব কিছু। প্রথমে সাঁচীতে যে স্তূপের পত্তন করেন অশোক, তারই উপর আরও বড় আকারের স্তূপ বানানো হয়। এইটিই সব চেয়ে বড় স্তূপ। ভবিষ্যতে স্তূপের সাজসজ্জা আরও বর্দ্ধিত হতে থাকে—মণ্ডপ, দেওয়াল, প্রদক্ষিণ পথ। স্তূপ তৈরীর উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধদেবের স্মৃতিতে মন্দির নির্মাণ ও তাঁর আরাধনা করা। পরে আরও স্তূপ তৈরী হয়।

বড় স্তূপকে যে পাথরের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার চারদিকে তোরণ তৈরী হয়েছে। তোরণই সাঁচীর প্রাণ। স্তূপ মূক। কোন লিপি নেই এতে।—কিন্তু তোরণ প্রাণবন্ত।—তোরণের নিচ থেকে উপর পর্যন্ত সজ্জার বাহার।—প্রস্তর চিত্র অসংখ্য—ছোট, বড়, লম্বা। বৌদ্ধ যুগের সমাজ-জীবনের চিত্রের রূপ।—রাজা, রাণী।—আছে সৈন্য, ফলের গাছ, প্রাণী অনেক প্রকারের। ফুলের গাছও বিদ্যমান। মনোহর রথ, পক্ষী, মানুষ। নারী—নানা ভঙ্গিমায়।—শোভাযাত্রার বাহার! চোখ জুড়ায়।

প্রধান স্তূপের চারদিকে চারটি তোরণ দ্বার। প্রথমে দক্ষিণেরটি তৈরী হয়। তারপর উত্তরেরটি। পর পর পূর্ব ও পশ্চিমের। প্রথম দুটি তোরণ তৈরীর বহু শত বছর পর পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি তৈরী হয়। এর প্রমাণ স্পষ্ট। প্রথম দুটির কারু-শিল্প সুস্পষ্ট, কাজগুলি পরিষ্কার। পরের তোরণ দুটির কাজ খুব সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু পশ্চিমের তোরণ দেখে মনে হয় যেন অধুনা কালের কাজ। এত তাজা যে ছেনী হাতুড়ীর ছাপ জীবন্ত।

কণিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্মের বাণীকে ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছেন। হর্ষবর্দ্ধনের আদেশ বিদিশা হয়ে সাঁচীর স্তূপেও গুঞ্জরিত হয়। কণিষ্কের সময় থেকে পাথরকে তেলের মত মসৃণ করার বিদ্যা আয়ত্বে আসে। গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডারের দান। ভারতের বাইরে হতে ওঁর দূতরা এসে রাজদরবারে আতিথ্য গ্রহণ করতো।

গ্রীক স্থাপত্যের প্রভাব সাঁচীর উপাসনা গৃহে আজও লক্ষ্য করার মতো। লম্বা চৌকোণা থাম উপরে উঠেছে।

প্রতি তোরণ দ্বারে, মাথার দিকে, উপরে সিংহের মূর্তি পাশাপাশি বিরাজ করছে। শক্তির আধার। তার উপর ছোট বৃক্ষ শীর্ষ—বোধী বৃক্ষের প্রতীক। আর চক্র —ধর্মের প্রতীক।

পূর্ব দিকের তোরণে বিরাট প্রস্তর ফলকে কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধের যাত্রা ও তার নীচে অশোকের পত্নীসহ বোধীবৃক্ষের তীর্থযাত্রা প্রাণবন্ত। তা ছাড়াও বিদেশী পর্য্যটক অথবা ব্যবসায়ীরা যারা ভারতে আসতেন, সেই বিদেশীদের উপস্থিতিও স্পষ্ট। ভিন্ন তাদের পোষাক।

উত্তরের তোরণের চিত্রে আম, কদলী বৃক্ষের পাশে আনন্দমগ্ন নরনারীর আহারের চিত্র একেবারে জীবন্ত। রাজার শোভাযাত্রা চলেছে। গবাক্ষ থেকে অন্য নারীরা বিস্ফারিত নয়নে অবলোকন করছে।—অপূর্ব!

দক্ষিণের তোরণে বোধীবৃক্ষের পাশে বুদ্ধ, যক্ষিণী, আর বস্ত্র পরিহিতা নরনারীর দল। হাত জোড় করা। ভক্তি নিবেদনে রতা। বস্ত্র নাভির নীচে। স্বল্পবাস নয়, পা পর্যন্ত ঢাকা।

সাঁচীর সবচেয়ে উন্নতি হয় গুপ্ত যুগে। হিন্দু ধর্ম যেমন আবার পুনরুজ্জীবিত হয় গুপ্ত যুগে, তেমনি বৌদ্ধ ধর্মের জন্যও মুক্ত হস্ত ছিলেন গুপ্তরাজারা।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে শুধু উপাসনায় নির্বাণ প্রাপ্তি হবে না। স্তূপ স্থাপনের দিকে ঝোঁক বাড়ে ভক্তদের মধ্যে। বহু ছোট ছোট স্তূপ তৈরী হয় সাঁচীর চতুর্দিকে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, চারটি তোরণ দ্বারে বুদ্ধদেবের উপাসনার অথবা উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে কোন মূর্তি নেই। আছে বোধীবৃক্ষ ও পদচিহ্ন। বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি তোরণে অনুপস্থিত।

কোন এক বংশের রাজা যদি স্তূপ তৈরী করেছেন, অন্য কেউ তাকে তোরণ উপহার দিয়েছেন কয়েক শত বৎসর পর। এমন দৃশ্য দেখা যায় অন্ধ্র রাজাদের কার্যে। তাঁরাও হাত বাড়িয়েছিলেন সংঘমের উন্নতি কল্পে।

স্তূপ ছাড়াও, বৌদ্ধ মন্দির গুপ্ত যুগের ছাপ বহন করছে। দ্বারের পাশে গঙ্গা, যমুনার দৃশ্য। গুপ্তরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও বৌদ্ধ বিহার উন্নত করেছেন। ধর্ম-সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। স্তূপের উপরে প্রদক্ষিণ পথে, দেখা যায় সুদূর দাক্ষিণাত্যের

দাতাদের উপস্থিতি। সাঁচীতো তীর্থ ক্ষেত্র। যে যেমন ভাবে পেরেছে ভক্তি নিবেদন করতে এগিয়ে এসেছে।

এবার বৌদ্ধ ভিক্ষু চুপ করেন। মহুয়া গাছের ছায়ায় শ্রোতারাও নিস্তব্ধ। সুদূর অতীত কালের ছবি সবার চোখের সামনে দিয়ে হু হু করে দৌড়ে যাচ্ছে।

শিলাহাদীও কিছু বলছে না। দুর্গাবতী পশ্চিমের তোরণের এক প্রস্তর চিত্রের দিকে, ওড়নার ভিতর দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।—বলিষ্ঠ রাজা ছিলেন অশোক। না, বিম্বিসার। দু'হাতে দুই রাণীর কোমর বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে। ওঁরতো অনেক রাণী ছিল। একটু সলজ্জভাব, কেন কে জানে, দুর্গাবতীর চোখে। রাজার হাত রাখার ভঙ্গি দেখে না রাণীদের স্বল্পবাসে! অথবা তাদের উন্মুক্ত বক্ষশোভা দর্শনে!

পাহাড়ের উপর চতুর্দিকে জঙ্গল। এখানেই হাজার বছর পূর্বে, বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি—ধর্মম্ শরণম্ গচ্ছামি—সংঘম্ শরণম্ গচ্ছামি শব্দে পর্বত গমগম করতো গুরু গম্ভীর নিনাদে। আজ সব স্তব্ধ। নিথর।

দূর দূর হতে ভিক্ষুরা আসতো। জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তির ভীড় লেগে থাকতো চৈত্য বিহারে। সভা হতো। আলোচনা চক্রে ঝড় উঠতো। উপসনায় ডুবে যেতো কেউ কেউ। কেউ থাকতো ধ্যান মগ্ন হয়ে, নির্বাণ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মনের কোণে। বুদ্ধ অন্ত প্রাণ সবার।

শিলাহাদীকে এবার দুর্গাবতী চুপি চুপি কিছু বলে।

শিলাহাদী, বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করেন। সাঁচী কেন পরিত্যক্ত, শূন্য জনমানব রহিত? ভিক্ষু তখনই জবাব দেন।

যতদিন অশোকের সিংহের প্রতীক শক্তি ও ধর্ম-চক্র কার্য্যকরী ছিল, ততদিন সাঁচীও জনসমাবেশে গম গম করতো। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু ক্রমে ভাঙ্গন ধরে। হর্ষবর্দ্ধনের পর, অতি উৎসাহী কোন শাসক আর পৃষ্ঠপোষকতা করেননি বৌদ্ধ ধর্মকে এগিয়ে নেবার জন্য।

বৌদ্ধ বিহারে কলহ বাড়তে থাকে। সংঘের নেতাকে অমান্য করা শুরু করে শিষ্যরা, ভিক্ষুরা। চৈত্য বিহারের নেতাদের মধ্যেও নানা অনাচার ঢুকে পড়ে। অর্থ, সম্পত্তি আয়ত্ত্বে আনা শুরু হয়। ত্যাগের বদলে, আয়েস আরামে দিন কাটানো শুরু করেন তাঁরা। কোথাও কোথাও ব্যভিচার ঢুকে পড়ে। যে নারীর সংঘে প্রবেশ নিষেধ ছিল, তারাও রাতের অন্ধকারে দলপতির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে বৌদ্ধ বিহার কলুষিত করে।

সর্বশেষে শঙ্করাচার্যের মত হিন্দু ধর্মের শক্তিশালী প্রচারক, দুর্বল সংঘকে চরম আঘাত হানেন। বৌদ্ধ ধর্ম এই আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে না। কারণ, বৌদ্ধ বিহারে তখন শিষ্যরা আত্মকলহে মত্ত। সংযমের স্তরে নেমেছে ধ্বস। কোন রাজপুরুষ আর এগিয়ে এলো না বুদ্ধ ধর্মকে পুনঃ সঞ্জীবীত করতে।

ধীরে ধীরে বৌদ্ধ বিহার পরিত্যক্ত হতে থাকে। ভিক্ষুরা চৈত্য বহার ছেড়ে যেতে লাগলো গ্রামের পথে। সাঁচীও ব্যতিক্রম নয়। এখানেও ফাঁকা হতে থাকে। জনমানব রহিত পর্বত শীর্ষকে জঙ্গলে ফের ঘিরে ধরে।

স্তুপের পরিক্রমা করার জন্য ভক্তের আনাগোনা বন্ধ হ'লো। শৃগাল, সরীসৃপ চৈত্যের সভামণ্ডলে বিচরণ করতে লাগলো। যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের বাণী উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করা হতো সেখানে নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা। ভিক্ষুদের নির্বাণ প্রাপ্তির বদলে, স্তুপেরই যেন নির্বাণ প্রাপ্তি হলো।

১৪

যুদ্ধের দুর্যোগের ভিতর, আজ গভীর রাতে রায়সেন দুর্গের সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে অতীতটা যেন সচল হয়ে উঠেছে—শিলাহাদীর চোখের সামনে। পট পরিবর্ত্তন হতে থাকে। হু হু করে দৃশ্যের অবতারণা হতে থাকে।··· দুর্গাবতীকে নিয়ে বিদিশা, সাঁচী যাত্রা। রায়সেন কেল্লায় রাণীর আঁচল ধরে কানামাছি খেলা। প্রাসাদের কোণে কেটেছে কত মধুর মুহূর্ত্ত। প্রেমের বন্যায় ভেসে গেছে কতবার।

সেবার ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে খাণ্ডোয়াতে রানা সংগের সাথে মিলিত হয়ে মালবের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে শৌর্যের পরিচয় দেয় শিলাহাদী।

দিন বদলে গেছে। এবারের যুদ্ধে পরাজয় দ্বারে করাঘাত করছে।···দুর্গ অবরুদ্ধ। মৃত্যুর হাতছানি দুর্গের প্রাচীর পার হ'য়ে এগিয়ে আসছে দৃঢ় পদক্ষেপে। শেষে কি রায়সেন দুর্গও সাঁচীর মত শূন্যপুরী হবে নাকি!

শিলাহাদী নিজেকে দুর্দ্ধর্ষ ভাবতো। একদা বিশাল তরুর মত ছিল সে। আজ যেন শুকনো কাঠ—যার নিজের কোন ছায়া নেই। অসহায় লাগে নিজেকে। অন্যকে কি আশ্বাস দেবে সে? সেইসব মধুময় দিনের স্মৃতি আজ ধুয়ে মুছে গেছে।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশের দিকে তাকায় শিলাহাদী। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সব ঝাপসা। যেদিকে বিদিশা, অতীতের ও আজকের গৌরবময় স্থান,.... গুজরাতের সুলতান মালব থেকে রায়সেন আসার পথে, তাকে হস্তগত করেছে।

অথচ এই গুজরাতও একদা বিদিশার সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা ছিল। অশোকের যুগে বিদিশা থেকে উজ্জয়িনী হয়ে গুজরাতের বন্দর দিয়ে তৈজসপত্র ভরে কত না বাণিজ্য তরী প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দিয়েছে।....অশোকের পুত্র কন্যাও সিংহল গেছে সমুদ্র পথে এখান দিয়ে, বিশাল তরণীতে।

হায়রে অদৃষ্ট। দিন বদলে গেছে।....দুঃখ করে কোন লাভ নেই।

বিগত বিশ বছর ধরে বিদিশার ঐশ্বর্য ও শস্যের ভাণ্ডার শিলাহাদীর রাজকোষকে স্ফীত করেছে। আজ তার অধিকার চ্যুত হলো।

রায়সেন দুর্গের স্মৃতির সাথে দুর্গাবতীর স্থান অনেকখানি জুড়ে রয়েছে।....মেবার কন্যা।....এখানের রাণী। চিতোরের দুর্গের মহলে ছুটে বেড়িয়েছে শৈশবে। আজ রায়সেনের পরিস্থিতিতে চিতোরের কথা বার বার মনে পড়ছে শিলাহাদীর।

একবার চিতোর যায় শিলাহাদী। মেবারের রাজধানী চিতোরের বৈশিষ্ট তখন ওকে মুগ্ধ করে। ছবির মত প্রাসাদ দুর্গ।...চিত্রাঙ্গদ মৌর্য্য থেকে চিত্রকোট ও পরে চিতোর প্রসিদ্ধি লাভ করে। গৌরবময় যুগে, বিদ্বান কৃতি কলাবিশারদদের উজ্জয়িনী যেমন পরম আদরের স্থান ছিল, তেমনি চিতোরেও রমরমা রাণা কুম্ভের সময় চরম শিখরে ওঠে।

চিতোর দুর্গ অন্য সব দুর্গের মত উঁচু মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তারপরে আবার ছোট প্রাচীর।....প্রাচীরের উপর দিয়ে পায়ে চলার ব্যবস্থা। দেওয়াল গাত্রে ছোট বড় নানা প্রকারের ছিদ্র। এর ভিতর দিয়ে শত্রুকে অকস্মাৎ আক্রমণ করা যায়। শত্রু প্রতিরোধের দ্বিতীয় পংক্তি। এত করেও কিন্তু আলাউদ্দীন খিলজীকে রোধ করতে পারে নি চিতোরের রাজা ভীম সিংহ।....দোষ ছিল না।....আলাউদ্দীনের রোষের কারণ ছিল রাণী পদ্মিনী।....না, ও কোন দোষ করে নি।....ওর শতদলের মত রূপই যত গণ্ডগোলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আলাউদ্দীনের চিত্তে চঞ্চলতা দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় অস্থিরতার। পরস্ত্রীর রূপে পাগল হয় আলাউদ্দীন।

স্বচ্ছ সরোবরের তীরে রাণী পদ্মিনীর তিন মঞ্জিলা মহলের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্গাবতীর গলা ধরে এসেছিল। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে, পদ্মিনীর দুর্ভাগ্যের কথা বলে শিলাহাদীকে।

....আলাউদ্দীন খিলজী চিতোর আক্রমণ করে। দুর্গ হয় অবরুদ্ধ। রাজপুতেরা, ভীম সিংহ ও তাঁর খুল্লতাত রতন সিংহের নেতৃত্বে খুব লড়েন। কিন্তু ক্রমে মনোবল ভাঙতে থাকে। এমন সময় একদিন রাণার কাছে আলাউদ্দীন খবর

পাঠায়।....সুলতানকে যদি সিংহল রাজদুহিতা পদ্মিনীর রূপ একবার দর্শন করতে দেয়, তবে সুলতান দুর্গের অবরোধ তুলে নেবে। রাজপুতরা এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু খুব চতুরতার সাথে কাজ করে। আলাউদ্দীনকে পুষ্করিণীর তীরে বড় প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। দেওয়াল আয়নায় দূরে দণ্ডায়মানা পদ্মিনীর প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়। আলাউদ্দীন হঠাৎ পিছন ঘুরে পদ্মিনীর রূপ-লাবণ্য চাক্ষুষ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পদ্মিনী এমন উঁচু স্থানে দাঁড়ায়, আলাউদ্দীন ওকে দেখতে পায় না।

—এতে রেগে ওঠে না অলাউদ্দীন? বোকার মত প্রশ্ন শিলাহাদীর।

—ওঠে না আবার। রাণা ভীম সিংহ যখন আলাউদ্দীনের সাথে দুর্গের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যান, তখন হঠাৎ করে রাণাকে বন্দী করে সুলতান। শর্ত দেয় যদি পদ্মিনীকে সুলতানের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তবেই রাণার মুক্তি।

—তা করলেই হোতো, সব ঝামেলা মিটে যেতো।

দুর্গাবতীর চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। শিলাহাদীকে এমন জবাব দেয় যেন আলাউদ্দীন ওর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, ও রাজপুতানী। যদিও শিলাহাদী ঠাট্টা করেছে, কিন্তু তা'ও বরদাস্ত করতে রাজি নয় ও।

—পতি বন্দী হলেও, পদ্মিনী কৌশলের আশ্রয় নিতে ছাড়ে না। যদিও জানে, সুলতানের বিশাল সৈন্যবলের পাশে সামান্য নারী কি করবে? ...পদ্মিনী বার্তা পাঠায় ও সুলতানের কাছে সে আসছে। ...আলাউদ্দীনের চোখে লালসার বহ্নি। সন্ধ্যার কোলে উদগ্র কামনা নিয়ে অপেক্ষারত। পদ্মিনী পাল্কি চড়ে আসবে। কয়েকটি পাল্কি সুলতানের তাঁবুর কাছে আসে। ...কিন্তু ওতে পদ্মিনী ও ওর দাসীদের বদলে, আসে কিছু সশস্ত্র সৈন্যদল। ওরা এক সাথে বের হয়ে আসে। ...হল্লা শুরু হয়। এই সুযোগ। ভীড়ের মাঝে ভীম সিংহ পালাতে সক্ষম হন। ...আলাউদ্দীনের রোষ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্ধকার রাত। পদ্মিনীকে পাবার বাসনা লোপ পায়। আশা দুরাশায় পরিণত হয়। এরপর আর কি? আলাউদ্দীন ক্ষিপ্ত হয়ে, চতুর্দিক হতে দুর্গ আক্রমণ করে।...হাজার হাজার নর-নারী প্রাণ দেয়। পদ্মিনী ওর রূপের ডালি নিয়ে, অন্দর মহলে অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করে। রাজপুতানীর আত্ম-বলিদানের সামনে, আলাউদ্দীনের লালসা চরিতার্থ হয় না। অল্প কিছুদিন পর, আলাউদ্দীন ছেলেকে কেল্লার ভার দিয়ে চলে যায়। ছেলেও কিন্তু বেশী দিন চিতোর কেল্লাকে হাতে রাখতে পারে নি।

দুর্গাবতী পূর্বপুরুষের কথা বলে একটু চুপ করে।

শিলাহাদী চিতোরের দুর্গে দাঁড়িয়েও কিছু বলতে পারে না। হৃদয় দ্রবীভূত। চুপ করে আছে। সামনের সরোবরে কি পদ্মিনীর প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে!

—জান, এই মহলেই রাণা কুম্ভের দিন কেটেছে পরে। ঐ দূরে রাণা কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ-এ যেন মালবের সুলতান মামুদকে পরাস্ত করার নিদর্শন। এ যেন আলাউদ্দীনের বংশধরের উপর বদলা নেওয়া রাণা কুম্ভের এত যুগ পরে।

শিলাহাদী এই বিশাল সাত মঞ্জিল বিজয় স্তম্ভের অপরূপ কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সময় চলে গেছে। রাণা নেই। কিন্তু তাঁর অমরকীর্তি জীবন্ত আজও। দুর্গাবতীর কথায় হুঁস্ হয় শিলাহাদীর।

—এই প্রাসাদেই আর এক তপস্বিনী নারী কাটিয়ে গেছেন তাঁর অমর জীবন।

শিলাহাদীব চোখে বিস্ময়। দুর্গাবতী কাব কথা বলছে বুঝতে পারে না।

—কৃষ্ণভক্ত মীবাবাঈ। মীবাবাঈয়ের ভজনের মধুর তান চিতোর দুর্গের প্রাকার পার হয়ে, মেবাবের পর্বতের বেড়াজাল অতিক্রম করে সারা ভারতবর্ষের আকাশ মুখরিত কবেছে। ...কৃষ্ণ নাম গেয়েছেন তিনি বিভোর হয়ে। চিতোরবাসী দুর্গের মন্দিরে ভীড় করেছে। ...রাণা পছন্দ কবেননি মীরাবাঈয়ের কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনীব প্রায় আচরণ। ...বাণার তোপ ওঁকে ভীত করতে পারেনি। ...হরি নাম গেয়ে বিষের পাত্র মুখে তুলে নিয়েছেন। প্রেম এমনই বস্তু। কৃষ্ণই স্বামী, কৃষ্ণই ধ্যান, কৃষ্ণই জ্ঞান। রাণা অত্যাচার করেছেন মীরাবাঈয়ের উপর, তবুও ওঁব কণ্ঠ গেয়ে উঠেছে...মীরা কে প্রভু কব রে মিলোগে...

চিন্তা অন্তহীন। বাঁধন হারা হয়ে চিতোরের বীর গাঁথা মনে উদয় হয়। ত্যাগের বীরত্বে শ্রদ্ধা জাগে মনে।

কিন্তু এবার রায়সেনের কি হবে? দুর্গ অবরুদ্ধ। শিলাহাদীও অতীতের পাতায় ইতিহাস হয়ে যাবে নাকি? ...ভেবে কোন পথ বেব করতে পারে না শিলাহাদী।

১৫

বাহাদুর শাহের প্রস্তাব মেনে নিলে রাজত্ব, রাণী আর নর্তকীর সাথে আরামে জীবন কাটাতে পারবে শিলাহাদী। সুখ স্বাচ্ছন্দ কায়েম থাকবে। ...নয়তো। ...নয়তো কি করতে পারে ও? শুধু মনোবলই সব নয়। সামর্থ থাকলেও, সম্বল

কোথায় ? সৈন্য নেই, অস্ত্র ভাণ্ডার নিঃশেষিত। অল্প কিছু অস্ত্র অন্তঃপুরে নারীদের বিশ্রামের স্থানে লুকোনো আছে। তাই সম্বল করে আলি শের খাঁর সম্মুখীন হওয়া পাগলামী ছাড়া কিছু নয়।

শিলাহাদীর সামনে দুর্গাবতী উপস্থিত হয়। ভৎসনা করে। না, বীরঙ্গনার রূপ তুলে ধরে।

—স্বামী, আমরা রাজপুত। এখানে থেকে আমরা রাজত্ব পরিচালনা করেছি। বশ্যতা স্বীকার করে, সামান্য আত্ম-সুখের জন্য কি আমবা জাতীয় সম্মান বিসর্জন দিতে পারি ? রাজপুতরা বীর। আমি জহরব্রত পালন করবো। ...আসুন।... তরবারি কোষ মুক্ত করুন। নারীরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করুক প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে। ...পঞ্চভূতে মিশে যাক নশ্বর দেহ। তারপর বীরেব মত, যবনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

রাণীর হুঁশিয়ারীতে চাবুকের শব্দ। শিলাহাদী কেঁপে ওঠে। রাণীর তেজদৃপ্ত মূর্তির সামনে নতি স্বীকার করে। সম্বিত ফেরে ওর। নিঝুম রাত, শবার রোমাঞ্চিত হয়। একটা প্যাচা কর্কশ শব্দ করে উড়ে যায়। ...হঠাৎ তরবারি বের করে, জয় মা ভবানী বলে নিমেষে, শিলাহাদী রাণীর মস্তক খণ্ডিত কবে। দেখতে দেখতে, অন্তঃপুরেব সাত শত মহিলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

রন্ধনশালার কাঠ দিয়ে চিতার আগুন জ্বলে উঠে। রায়সেন দুর্গ এখন শশ্মান। মহা স্তব্ধতা নামে বাদল ও রোহিণী মহলে। ...আর নূপুর বাজবে না এখানে কোন দিন। নর্তকী পানপাত্র হাতে এগিয়ে আসবে না। ...অন্তঃপুরে রাণী ঘোমটা টেনে অপেক্ষা করবে না রাজার জন্য প্রেমের অভিসারের অর্ঘ্য নিয়ে।

সব শেষ। এবার কি করবে ?

এরপর হর হর মহাদেব বলে, শিলাহাদী, ছোট ভাই লক্ষ্মণ সিংকে এবং মাত্র এক শত বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে, গৈরিক বসন পরে, দুর্গ দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। গৈরিক বস্ত্র, ত্যাগের প্রতীক। আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তুত ওরা।

কিন্তু আলি শের অনেক বেশী বলবান। ওর অনুচর সংখ্যায় অধিক। তাদের সামনে শিলাহাদী মোকাবেলা করতে পারবে কেন ? মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ সংবাদ পেয়ে, বাহাদুর শা উল্লসিত হয়ে, তড়িৎ গতিতে এসে দুর্গ দখল করে। কিন্তু রাতের রোশনাইতে ওর বুক যেন কেঁপে ওঠে...কোথাও কি কান্নার শব্দ ভেসে আসছে ? ...চাপা শব্দ গুমরে উঠছে। মহলের দেওয়ালে কি লাল রঙ ! রক্তের, হোলির, না, সতীদের আত্মত্যাগের অগ্নিশিখার ?

বাহাদুর শা বেশীদিন এখানে থাকেনি। নারীর আত্মত্যাগেব কাহিনা কি মনকে ধাক্কা দেয় তার ? কলপীর শাসক সুলতান আলমকে রায়সেনেব অধিকর্তা বানিয়ে ধারওয়ার অভিমুখে চলে যায়।

গায়ের জোর সর্বদা কার্যকবী হয় না। বাহাদুর শাহ গুজরাত ফিরে যাবার সময় পাঁচশত বছরের পুবোনো রাজা ভোজের বিজয় লৌহ স্তম্ভ সঙ্গে নিয়ে যেতে মনস্থ করে। বিজয়েব প্রতীক। বাজা ভোজ এক কালে তেলেঙ্গানার বাজা গঙ্গদেওকে পবাস্ত করে রাজধানীতে স্থাপন কবেছিলেন এই স্তম্ভ।

পুবোনো হওয়া সত্ত্বেও স্তম্ভটি মসৃণ। স্তম্ভকে মাটি থেকে তুলতে গেলে ভেঙ্গে তিন টুকবো হয়। ঐতিহ্যবাহী স্তম্ভ হয়তো স্থান বদল সহ্য কবতে পারেনি। বাহাদুব শাব মনস্কামনাও পূর্ণ হয় নি।

১৬

বাবেব যুগ শেষ। এলো পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে। বায়সেন দুর্গও ওব অধিকারে আসে। কিন্তু কতক্ষণ ? শের শাহ তো ওকে শুধু তাড়াই করেছে। মোগল সম্রাটকে শান্তিতে দিনপাত করতে দেয়নি।

ভূপালের কথা পিছনে পড়ে বইলো। শের শাহের সময় থেকে ভূপাল একটু শান্তিতে, খানিকটা নিরুপদ্রবে কাটায়। তখন ভূপালেব রাজা মানেশ্বর শের শাহকে পত্র লিখে জানায়—জাঁহাপনা, যদি সুযোগ আসে, তবে এদিকে একটু ঘুবে যাবেন, আমার প্রজারা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে উৎসুক। অবশ্য এদিকে আসার সুযোগ হয়নি শের শাহের।

বাহাদুর শার মৃত্যুর পর, ওর বংশধর রায়সেন কেল্লার ভার, ফের শিলাহাদীর পুত্র রাজা ভূপতকে দেয়। কাবণ, রাজপুতদের সাথে দোস্তি চাই। রাজা ভূপতের পর গদীতে বসে ওর অল্প বয়স্ক পুত্র। কিন্তু শিলাহাদীর অন্য পুত্র পুরণমলই ছিলেন আসল কর্তা। তিনিই পরিচালনা কবেন রাজকার্য।

শের শাহ মালব বিজয়ের পথে যাবার সময়, গোয়ালিয়রের তোমর রাজা রাম শাহকে পাঠান, পুরণমলকে ধরে আনতে। প্রথমে পুরণমল যেতে অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য ছয় হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে পুরণমল শের শাহের সামনে উপস্থিত হন। শের শাহ ওঁর সাথে ভাল ব্যবহারই করেন। তবে ওঁর ছোট ভাই ছতরমলকে প্রতিনিধি হিসাবে রেখে দেয়। পুরণমলকে রায়সেন ফিরে যেতে বলে। চতুর শের শাহের চাল বুঝতে পারে না পুরণমল।

যেহেতু বর্তমানে শের শাহ মালবের শাসক কাদির শার বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছেন, সেই জন্য রাজপুত পুরণমলের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে চান না। কারণ অন্য রাজপুতরা ওর সঙ্গে আছে কিনা তা বুঝতে পারেন নি শের শাহ। পুরণমল যে প্রথমে তাঁর আহ্বানে আসতে অস্বীকার করেছিল মনে রেখেছেন বৈকি তিনি। ঠিক আছে। সব প্রতিকার যে এখনই করতে হবে এমন নয়। ভবিষ্যতের জন্য কিছু তোলা থাক।

মালব জয় করে, উজ্জয়িনীতে বসে, শের শাহ ফরমান জারি করেন। কাদির শাহকে লাখৌটি রাজ্য দিতে চায় মালবের বদলে।...লাখৌটি মানে বাঙ্গলা সুবা। শের শাহ যে কত চতুর তা কাদির শাহর বুঝতে বাকি রইলো না, এখান থেকে সরিয়ে দিতে চান শের শাহ তাকে বহু দূরে।...ও স্থান সম্পূর্ণ অপরিচিত। জলো পরিবেশ। বাধ্য হয়ে কাদের শাহ মাথা নত করে। পরিত্রাণ পায় নজরাণা দিয়ে।

রণথম্ভোর দুর্গ জয় করে, ফের পুরণমলের সাথে দেখা হয় শের শাহের। উনি জানতেন যে রায়সেন দুর্গ হস্তগত না করতে পারলে, মালব সুরক্ষিত থাকবে না। তবে এখনই নয়। আপাততঃ বিহার ফিরে যান শের শাহ।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে, শের শাহ ফের এদিকে এসে চান্দরী দুর্গ দখল করে, পুরণমলকে ভয় দেখান। রাজপুত রাজা মেদিনী রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শের শাহকে সাহায্য ক'রে পুরণমলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। শের শাহ খুশি হয়ে চান্দেরী দুর্গ ওকে উপহার দেন। শেষে নিজে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে রায়সেন দুর্গ অবরোধ করেন।

চার মাস ধরে অবরোধ অবস্থা চলে। শের শাহ বুঝতে পারেন রায়সেন দুর্গ জয় করা সহজ নয়। ঠিক এই রকমেরই হাল হয়েছিল ওঁর হুমায়ুনের সাথে লড়াইতে চুনার দুর্গে।

শেষ পর্যন্ত কামানের সাহায্যে দুর্গ আক্রমণ করাই মনস্থ করে। যদিও দুর্গের, এর ফলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। যত লোহা আর পিতল সঞ্চিত ছিল তাই দিয়ে কামানের গোলা তৈরী করা হয়। এর পর চতুর্দিকের জঙ্গলের মধ্য থেকে, দুর্গের উপর তোপ দাগা শুরু হয়। দুর্গের ভিতর হতেও প্রত্যুত্তোর আসে। কিন্তু পুরণমলকে যেন নিঃশ্বাস নিতে দেয় না।...বারুদের গন্ধ। আকাশের রঙ্ বদলে যায়। ধোঁয়া আর ধোঁয়া। পুরণমল চিন্তিত হয়ে পড়ে। কি করা যায়। নিষ্কৃতির পথ দেখা যায় না।

অবশেষে সন্ধি বার্তা পাঠায় শের শাহের কাছে। ক্ষণিকের শান্তি নেমে আসে।

পত্র আদান প্রদান হয়। শের শাহ ওকে বেনারস চলে যেতে বলেন। ঐ পরগণা ওকে দিতে চান। কিন্তু পুরণমল রাজি হয় না। তবে সংবাদ পাঠায়, ও কেল্লা পরিত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু কি শর্তে—

—আপনি যদি আশ্বাস দেন যে কেল্লায় যত রাজপুত আছে, তারা নির্বিঘ্নে অন্যত্র চলে যেতে পারবে তাহলে আমি কেল্লা ছেড়ে দেবো।

পুরণমল, শের শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানের নিকট হতে আশ্বাস চান।

—ঠিক আছে। আপনি যেমন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তেমনিই হবে।

আদিল খান আশ্বস্ত করে পুরণমলকে। এরপর কয়েক হাজার রাজপুত—নিজ পত্নী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে এবং যাবতীয় বস্তু সামগ্রী নিয়ে কেল্লা হতে নেমে আসে। শের শাহের সৈন্যরা ছাউনী থেকে একটু দূরে আস্তানা পাতে।

সন্ধ্যাকাল। সারাদিন রাজপুতরা নিজ নিজ জিনিসপত্র নীচে নিয়ে আসে। তারপর কোন রকমে তাঁবুর খোঁটা গাড়ে। রাত্রির ভোজনের আয়োজন চলে।

আকাশের গায়ে মিটি মিটি তারা। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। এত দুঃখের ভিতরও কিন্তু এক বাউলের একতারা উদাসী তান বেজে চলেছে। রাত প্রায় শেষ।…কিন্তু একি? বাউলের একতারার তার ছিঁড়ে যায়।…বাতাসে ভৈরবীর তান নয়।…কাল ভৈরব নৃত্য করে ওঠে।…ইয়ে আল্লা চিৎকারে ভোরের বাতাস উত্তাল হয়।

শের শাহের আফগান সৈন্যরা হঠাৎ রাজপুতদের আক্রমণ করেছে। এতো কোন যুদ্ধস্থল নয়। সবাই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। পরিশ্রান্ত। সারাদিন ব্যস্ত ছিল দুর্গ ত্যাগের জন্য।

পুরণমল জেগেই ছিল। ঘুম আসেনি। ও বুঝতে পেরেছে শের শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁবুর বাইরে আসে। হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে তাঁবুতে তাঁবুতে। অবস্থা বেগতিক দেখে, ফের তাঁবুর ভিতর চলে আসে। সময় নেই চিন্তা করার।…তরবারি কিংখাপ হতে বের করে। পত্নী রত্নাবলীকে তৈরী হতে বলে।…ওর শিরচ্ছেদ করে। পুরণমলের সৈন্যরাও ওর অনুকরণ করে। এরপর যা বাকি থাকে, আফগান সৈন্যরা তা শেষ করে।

শের শাহের রায়সেন কেল্লা দখল সম্পূর্ণ হয়।

হায়রে ভাগ্যর পরিহাস!…শিলাহাদী প্রথমে!…তারপর ওর পুত্র পুরণমল।

...রায়সেন দুর্গের মৃত্তিকা ওদের স্থান দিল না।...দুই রাণীও রাজার তরবারি আঘাতেই প্রাণ দিল।

আকবর এবং পরবর্তী যুগে প্রত্যেক মোগল সম্রাটই রায়সেন দুর্গকে নিজ অধিকারে রাখে।...সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পর যেমন ভারতের চতুর্দিকে ভাঙন দেখা দেয়, রায়সেনও তেমনি হস্তচ্যুত হয়। ওর সেনাপতিরা যে যেমন পারে, বিদ্রোহ করে সুবা পরগণা দখল করে বসে ছোট ছোট সুলতান রূপে।

১৭

রাণা কমলাপতির কাছে আসার সুযোগ খোঁজে দোস্ত মহম্মদ। কথায় বলে, যার যা কাজ সেই কাজ ভগবান তাকে দিয়েই করান। দোস্ত মহম্মদও রাণীর উপকার করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ভূপালের কিছু দূরে সুদৃঢ় গিন্নোর কেল্লা। এ দুর্গ রাণী কমলাপতির অধিকারে। ওর স্বামীকে, ওর আত্মীয়রা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে। কমলাপতি, দোস্ত মহম্মদকে ওদের শায়েস্তা করার জন্য অনুরোধ করেন। দোস্ত মহম্মদ হাতে স্বর্গ পায়। এগিয়ে আসে। এলাকাদারকে শাস্তি দেয়। অধিকার করে নেয় ওর জায়গীর।

রাণী খুশি হয়ে ওকে ভূপাল উপহার দেয়। কমলাপতি রাণী। রাণীর মতই কাজ করেছে। উদারতার পরিচয়। লোকে বলে—

তাল মে তাল, ভোপাল তাল, বাকি সব তলৈয়া
রাণীয়ো মে রাণী কমলাপতি, বাকি সব রণৈয়া।

ভূপালের হিন্দু রাজত্বের ঐ শেষ। শুরু হয় মুসলমান নবাবদের শাসনের যুগ। সরোবরের পাশে সুরম্য রাণীর মহল দোস্ত মহম্মদের হাতে আসে। কালক্ষেপ না করে, ও রাজা ভোজের কেল্লার প্রাচীরের পাশে, নূতন করে কেল্লা বানায়। ও জানতো—শক্তির আধার কেল্লা। ভোজের কেল্লার অনেকখানি অংশ সরোবরের সলিল গ্রাস করেছে।

দোস্ত মহম্মদ বিশাল সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকে। নগণ্য স্থান ভূপাল।···তাকে নিয়ে কল্পনার জাল বোনে। নিজে হবে সম্রাট। ভূপাল হবে তার রাজধানী। ওর চিন্তা সরোবরের জলে তরঙ্গ তোলে।

দোস্ত মহম্মদ কল্পনার রূপ দিতে শুরু করে। ক্রমে ভূপালে কেল্লা বানিয়ে ফেলে। সৈন্য সমাবেশ করে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। রাজধানী পত্তনের কাজে নিজেও সরোবরের তীরে নলখাগড়ার আগাছা কেটে সাফ করেন। তাই

উপজাতি গোণ্ডরা ওকে আগাছা কাটা অথবা বারু কাট বলতো হেসে হেসে—ওর অস্থিরতা দেখে। ও চাইতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে। জীবন সীমাহীন নয়। তাইতো তাড়া।

কিন্তু যে গোণ্ড-রাণী কমলাপতি ওকে নগণ্য—কিন্তু ছবির মত ভূপালকে দান করেন, দোস্ত মহম্মদ সেই রাণীকেও রেহাই দেয় নি···রাণীর মৃত্যুর পর এক ঝটকায় গিন্নোর কেল্লা দখলে আনে। রাণীর পুত্র নওয়াল শা আর তার সৈন্যদের হত্যা করা হয়। অবশ্য ওর রাণীকে রেহাই দেয়।

এ সময়, ঔরঙ্গজেবের পর মারাঠাদের প্রহারে, মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এদিকটায় মারাঠারা কমই উৎপাত করে। তাই ভূপালে বেশ করে গুছিয়ে বসে পাঠান সর্দার। কিন্তু ধরাতলে বেশী দিন সুখ ভোগ করা ওর আর হয়ে উঠলো না।

এদিকে ভারতের মাটিতে নূতন বণিকের দল বহুরূপীর বেশ ধরে আবির্ভূত হয়েছে। ইংরেজদের কেউ চিনতে পারেনি।...ওরা বাণিজ্য করবে বাঙ্গলায়।··· দিল্লীর দুর্বল বাদশাহ ফারুকশায়র কেবল তিন হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে এর-জন্য ফরমান জারি করেন।

১৮

দোস্ত মহম্মদের উত্তরাধিকারী হন ইয়ার মহম্মদ খান।

হায়রে অদৃষ্টের পরিহাস! যে দোস্ত মহম্মদ খান এত পরিশ্রম করে ভূপাল রাজ্যের প্রসার করেন, তাঁর ৭১ বছরের সাধনার ফল যেন বিফলে গেল। ছয় সামর্থ্যবান পুত্র থাকতে, গদীতে বসে ইয়ার মহম্মদ খান—দোস্ত মহম্মদের অবৈধ সন্তান। ...এ কি জগদীশপুরের জায়গিরদারের দগ্ধ আত্মার অভিসম্পাত। ··· না রাণী দুর্গাবতীর মৃত আত্মার দীর্ঘশ্বাসের ফল! দোস্ত মহম্মদের বংশধর রাজ্য পেল না। কপাল একেই বলে।

দোস্ত মহম্মদের রাজত্বকালে, ওর দু'মুখী নীতির জন্য, নিজাম ক্ষুব্ধ হয়ে ইয়ার মহম্মদ খানকে নিয়ে গিয়েছিলেন, জামিন হিসাবে, দোস্ত মহম্মদকে শায়েস্তা করার জন্য। ওর মৃত্যুর পর, নিজাম ইয়ার মহম্মদকে মুক্তি দেন এবং ভূপালের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করেন। 'মাহি মারতিব' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে—রাজপতাকা, একটি হাতি ও এক হাজার ঘোড়সওয়ার দিয়ে, ইয়ার মহম্মদকে ভূপাল পাঠান। অবশ্য ভূপালের প্রতিপত্তিশালী মৌলবী ও সর্দাররা দোস্ত মহম্মদের

নাবালক আট বছরের ছেলেকে গদীতে বসাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় না। ইয়ার মহম্মদ ভূপালে এসে পৌছায়, এবং প্রায় বিনা বাধায় গদীতে বসে পড়ে। সবাই তখন সুড় সুড় করে সরে যায়। যদিও ইয়ার মহম্মদ কখনও নবাব উপাধি ধারণ করেনি, তবু চুটিয়ে নবাবী করে।

গদীতে বসে নূতন নবাব ফের ইসলামনগরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায়—যেখানে দোস্ত মহম্মদ পূর্বে এর পত্তন করেছিল। কেল্লাকে আরও সুদৃঢ় করা হয়। উঁচু দেওয়াল মাথা তোলে। প্রাসাদের পরিবর্তন হয়। মোগল ধারার অনুকরণে আকর্ষক বাগিচা তৈরী হয়। মুসলমান শাসকরা যেমন আরাম এবং প্রমোদ প্রিয় হন, ইয়ার মহম্মদও ছিল সেই ধারার ধারক ও বাহক। সেই ঐতিহ্য অনুসারে চমৎকার সৌর হামাম তৈরী করা হয়। স্নানাগার তৈরী হয় নব পরিকল্পনায়। দুর্গের ভিতর থেকে মাটি কেটে, নিচু করে বাগিচা তৈরী হয় অন্দরমহলে। এমনটি সাধারণতঃ চোখে পড়ে না।

ঘর যখন ঠিকঠাক হল, এরপর রাজ্যের পরিধি বাড়াতে মনযোগ দেয় ইয়ার মহম্মদ। বুঁদি, কোটা রাজ্যের এলাকা পর্যন্ত ধাওয়া করে। আশেপাশে হানা দিয়ে রামপুরা, খারোদ, ভানপুরা অধিকার করে। বহু নরনারী বন্দী হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সূর্য ঢলে পড়ে দিগন্তের কোলে। শুধু লাল আভার প্রকাশ আম্রকুঞ্জে মাদকতা ছড়িয়ে দিয়েছে। আম বাগানের ছায়ায় বসে ইয়ার মহম্মদ বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ...কিন্তু একি? ঐ দূরে বন্দীদের মধ্য থেকে কে এক নারী জল নিয়ে যাচ্ছে! গাগরি থেকে জল ছল্কিয়ে পড়ছে ঘাঘরায়, ওড়নীতে। জল পড়ে সিক্ত নিতম্বের নৃত্যকে আরও আকর্ষক করছে। নারী সৌন্দর্যের অপরূপ রূপ। মাখনের ন্যায় ত্বক। সারা অঙ্গ কামনার বহ্নিশিখা। ইয়ার মহম্মদের চক্ষু স্থির। বুকের মাঝে রক্ত নেচে ওঠে। মন হয় হিল্লোলিত। কে এ যুবতী? বন্দীদের মাঝে এমন সুন্দরীও আছে—অনেকের ভীড়ে, অনাদরে!

ইয়ার মহম্মদ তালি বাজায় হালকা করে যেন ঐ সুন্দরী শুনতে না পায়। খোজা প্রহরী এসে কুর্নিশ করে।

—ঐ যে ওরৎ গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছে—ওকে—

—ধরে আনবো হুজুর।

—বেয়াদপ, ধরে কেন আনবি? এমনি—

—গুস্তাকী মাফ। ওকে ধরেই আনতে হবে। কয়েকদিন হল ওকে বন্দী বানানো হয়েছে। বড় তেজী হুজুর—

—হুঁ।

ইয়ার মহম্মদের গোঁফের কোণে বাঁকা হাসি। তেজী তো হবেই। সুন্দরী যে। বাগে আনতে হয় ওদের। নারী বন্দীদের খোজা প্রহরীর অধীনে রাখা আছে। ওরা টের পেয়েছে এই রমণীর মেজাজ।

—ঠিক আছে। ওকে আন। পেশ কর।

খোজা সিপাহী ছোটে মালিকের হুকুম তামিল করতে। প্রহরী এসে তাঁবুর বাইরে মশাল জ্বেলে দেয়। ইয়ার মহম্মদ তাঁবুর ভিতর গিয়ে গোঁফে, কুর্তায় আতর লাগিয়ে আসে।

ততক্ষণে দু'জন প্রহরী ঐ যুবতীকে সঙ্গে করে এনেছে। ঐ যুবতী যখন শুনেছে, নবাব তলব করেছে, যেন বিনা প্রতিবাদে চলে এসেছে। প্রহরীর অনুসরণ করেছে। বন্দী ও। কি আর করার আছে ওর। মুঠীতে আবদ্ধ প্রাণ শেষ হতে কতক্ষণ ?

ইয়ার মহম্মদ হাতের ইশারায় খোজা প্রহরীদের চলে যেতে বলে। কুর্সি হতে উঠে দাঁড়ায়।

নারীর মুখে ঢাকনা। কিছুক্ষণ পূর্বের বসনই পরিহিতা। সিক্ত ঘাঘরা পুরুষ্টু নিতম্বে চেপে আছে। স্পষ্টতর করছে যৌবনকে। নারী স্থির। অপেক্ষা করছে, নবাব কি জন্যে ডেকেছে। দুরু দুরু বুক। নবাব একটু এগিয়ে আসে। হালকা করে, আঙুল দিয়ে ওড়নী একটু সরায়। মশালের আলোকে মুখ উদ্ভাসিত।

…ইয়া আল্লা। …হুর…পরী—

ইয়ার মহম্মদের বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ঝরে। হালকা আলোর ছোঁয়া লেগেছে কপালে। ভীরু আঁখিতেও।

যৌবনের রঙীন দোলায় নারীতো বহু দেখেছে ইয়ার মহম্মদ। কিন্তু রূপ কি এত সুন্দর হয় ? আনার সদৃশ গাল। বেদানার রস উপছিয়ে পড়ছে পাতলা ঠোঁট থেকে। পুরো শরীরের উপর দিয়ে চোখ বোলায় নবাব। থরে থরে সাজানো সৌন্দর্যের পসরা।

নবাব এগিয়ে এসে রমণীর হাত তুলে নেয়। ও কি হাত একটু শক্ত করলো নাকি ? কৈ নাতো। পর পুরুষের ছোঁয়া। এই পরিস্থিতিতে অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর। বন্দীর করার কি থাকতে পারে ? তাও নবাবের সম্মুখে। বেয়াদপী দেখালে গর্দান যেতে কি দেরী লাগবে ?

চিবুকটা একটু তুলে ধরে ইয়ার মহম্মদ জিজ্ঞাসা করে—কি নাম তোমার ?

যুবতী ইতস্ততঃ করে। ভীরু কপোতী। খাঁচায় বন্ধ যে।

সুঠাম রাজপুতবালার উত্তর শোনার অবসর কোথায় ইয়ার মহম্মদের। ওর হাত ধরে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে আসে। অন্ধকারে। কিছু বলার সুযোগ কোথায় ? ততক্ষণে ইয়ার মহম্মদের মুখ ঐ নারীর মুখের পাশে নেমে আসে। রাজপুতানীর উত্তর দেবার সুযোগ সীমিত হয়।

—তোমার নামের দরকার কি ? আজ হতে তোমার নূতন নাম—মালিকা। আমার দিল কা মালিকা।

বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিন্তু তাঁবুর হাওয়া উত্তপ্ত। ইয়ার মহম্মদ অস্থির। হঠাৎ শব্দ ফুটে ওঠে অসহায় নারী কণ্ঠে। বাতাস গম গম শব্দ করে অন্ধকারে—

ইয়ার মহম্মদের দেহে ঢিলেমী আসে ক্ষণিকের জন্য। কি বলতে চায় এ যুবতী। ও কি জানে না কার হাতের বেষ্টনীর মধ্যে ওর দেহ ?

—শুধু দিল কা মালিকা নয়।

অন্ধকারে ইয়ার মহম্মদ বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর করে, যুবতীর মুখের কাছে হেলে প্রশ্ন করে—মানে ?

—দিল তো জোর করে কেড়ে নিয়েছেন, ঘরের বাইরেও ইজ্জত চাই।

অন্ধকারেও ইয়ার মহম্মদ কেঁপে ওঠে। মাথা টনটন করে। বেয়াদপী ? না। কিন্তু খুশি হয় যুবতীর হিম্মতে। এ নারী অন্তঃপুরের পরও, সিংহাসনের পাশে স্থান চাইছে। বাঁদী নয়, বেগম। স্থায়ী অধিকার।

হা...হা...অন্ধকারেও ইয়ার মহম্মদের হাসি ফেটে পড়ে। মনে আনন্দের বান ডেকে যায়। এ নারী বোধহয় সে গুণ রাখে।

—মঞ্জুর। মেরে গুলবদন।

রাজপুতানীর বুকের আরও নিকটবর্তী হয়। বেগম হবার মত মনের জোর আছে।

ইয়ার মহম্মদের পত্নী আছে, সন্তানও হয়েছে। এই হিন্দু রমণীকে কলমা পড়িয়ে নিকা করল না নবাব। তাতে কিছু যায় আসে না। এরপর ওর নামকরণ হয় মাজী বেগম। তবে অচিরে মামোলা বেগম নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। সর্বক্ষেত্রেই মামোলা উপস্থিত। অতীতে যেমন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর পত্নী

নূরজাহান করতেন, রাজকার্যে পুরোপুরি দখল মামোলার। সুন্দরীর জয় সর্বত্র। ইয়ার মহম্মদ গোলাপী মামোলার চোখের ইশারাতে চলে। রাজপাট ওর মুঠীতে।

মামোলার পালকের মত নরম বাহুবন্ধনে, নবাবকে নিরিবিলিতে কাটাতে দেয় না মারাঠীরা। সখের হামামে সুগন্ধি আতর মাখা জলে, মামোলার সঙ্গে জল-কেলিতে বাধা পড়ে। দেহের জলকণা মোছার অবসর হয় না। বাঁদীর মুখে হামামের ভিতর সংবাদ আসে···মারাঠারা ভূপাল আক্রমণ করেছে। শত্রুর নামে বুক কাঁপে। নির্দয় মারাঠা। শান্তিতে থাকতে দেবে না একটু।

সিন্ধিয়ার সৈন্য ভূপালের কেল্লা আক্রমণ করেছে। বাজিরাও পেশোয়া এসে যোগ দিয়েছে। বানের মত হুড় হুড় করে মারাঠা সৈন্য এসে ভূপাল দুর্গ অবরোধ করে।

ইয়ার মহম্মদের মাথায় বাজ পড়ে। ইসলামনগরে মামোলার মাখন সদৃশ মৃণাল বাহু ছেড়ে ভূপালের দিকে ছোটেন। সন্ধ্যায় হলালী নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ হতে দূরে যেতে হয়। কিন্তু ভূপালে এসে কারও কোন সাহায্য না পেয়ে ইসলামনগরে ফিরে আসেন নবাব। পেশোয়াও সুযোগ হাত হতে যেতে দেন না। ইসলামনগর দুর্গের তিন দিক হলালী নদীতে ঘেরা। পেশোয়া প্রধান দ্বারে আঘাত করেন। এই দুর্গও অবরুদ্ধ হয়। কোনরূপ রাস্তা না দেখে পরিত্রাণ পাবার জন্য সন্ধির প্রস্তাব পাঠায় নবাব।···নগদে পাঁচ লাখ টাকা, অশ্ব ও রসদ। মারাঠাদের দারুণ অর্থের প্রয়োজন যে। বাজিরাও দ্রুত বিদিশা অধিকার করে, দিল্লীর পথে কদম বাড়ায়। ইয়ার মহম্মদ বেঁচে যায়।

দিল্লীর দুর্বল মোগল বাদশাহ ঘাবড়ে ওঠেন। নিজামকে সহায়তার জন্য তলব করেন। মোগলদের মধ্যে উনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ শাসক।.. নিজাম সৈন্য ও মারাঠা সৈন্যরা কায়দা করে, একে অন্যকে শায়েস্তা করতে সচেষ্ট। মধ্য ভারতে ভূপালের নবাব বেশ শক্তিমান। তাকে মদত জোগাতে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে নিজাম ভূপালে এসে হাজির হন। উদ্দেশ্য, মারাঠাদের শক্তি খর্ব করা। ইয়ার মহম্মদও হাত বাড়ান। খুশি উপচে পড়ে। কিন্তু তা' ক্ষণস্থায়ী হয়।

চতুর পেশোয়া কায়দা করে, অতর্কিতে নিজামকে ভূপালে ঘিরে ফেলেন। ভূপালে আসার পূর্বে নিজাম বহু গোলাবারুদ আর কামান, রায়সেন দুর্গে রেখে এসেছেন। এমন হবে, নিজাম ভাবেন নি। এক সপ্তাহের ভিতর মোগল সৈন্যের হাল খারাপ হতে থাকে। করুণ অবস্থা। ঠিকমত রসদ যোগান হয় না। কেল্লার ভিতর জিনিস অপ্রতুল হয়ে ওঠে। ভূপালের জলাশয়ে প্রচুর জল।

অথচ সৈন্যরা তৃষ্ণায় বুক চাপড়াচ্ছে। জল আনতে পারে কৈ? দুর্গদ্বারের বাইরে আসবে কি করে? বাজপাখির মত মারাঠারা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজাম সৈন্যদের উপর।

ইয়ার মহম্মদ বাধ্য হয়ে মারাঠাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করে স্থায়ী শান্তি কেনে।

—নবাব, এবার ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এরপর যদি ফের চুক্তি ভঙ্গ হয়, তবে ঝিলের তলায় জায়গা খুঁজতে হবে—মুচকী হেঁসে পেশোয়া বলেন।

পনের দিন ভূপালে আতিথ্য গ্রহণ করে, পেশোয়া মালবের দিকে যান। নিজামও বাধ্য হয়ে মালবের উপর মারাঠাদের আধিপত্য স্বীকার করেন। ইয়ার মহম্মদকে বার্ষিক ৬৯৪১৪ টাকা কর এবং মহলেব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত তিন হাজার টাকা দেওয়া স্বীকার করতে হয়। তখনকার মত টাকা নগদে নিয়ে যান পেশোয়া।

চুক্তির ফলে রাজ্যে স্থায়ী শান্তি আসে। ইসলামনগর দুর্গের ছাদে আনন্দের আসর বসে। সানাইতে মধুর ধূণ তোলে ওস্তাদ।...কিন্তু মানুষ কি অমর? পরের বছরেই নবাবের এন্তেকাল হয়। সাধারণতঃ মুসলমান পরিবারে যেমন হয়, নবাব বৃহৎ পরিবার আর নয়টি সন্তান রেখে যান পিছনে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ফয়াজ মহম্মদের বয়স তখন এগার বছর মাত্র।

১৯

ভূপালের গদী নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায়, ইয়ার মহম্মদের ভাই, সুলতান মহম্মদ খানকে, বাইশ বছর বয়সে ভূপালের গদীতে বসানো হয়।

শুধু রূপবতীই ছিল না মামোলা বেগম, ছিল প্রখর বুদ্ধিমতীও। ভূপালের গদীতে ইয়ার মহম্মদ খানের ভাইয়ের বদলে পুত্রকে বসাবার জন্য কূট মন্ত্রণা শুরু হয়। যদিও নিজের কোন সন্তান ছিল না মামোলা বেগমের, কিন্তু ইয়ার মহম্মদের অন্য বেগমদের পুত্র কন্যাদের আপন পুত্র কন্যা হিসাবেই দেখতো সে।

বালক ফৈয়াজ মহম্মদের হিতৈষী, মন্ত্রী বিজয়রাম এ খবর পেয়ে কাল বিলম্ব না করে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলামনগর থেকে ভূপালে এসে হাজির হয়। এখানে এসে এমন অভিনয় করে বিজয়রাম, যেন ও সুলতান মহম্মদকে সাহায্য

করতে এসেছে। কেল্লার প্রত্যেক দ্বারে ও প্রাচীরের নীচে সৈন্য মোতায়েন করে। যাতে বাইরে থেকে, কেল্লার ভিতর সাহায্য না আসতে পারে।

সুলতান মহম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে পালায়। ভূপালের এক কোণে, ইদগা পাহাড়ীতে দু' দলে দারুন লড়াই হয়। সুলতান মহম্মদ কোন মতে পালিয়ে রাহতগড় দুর্গকে দখলে আনে। পুনরায় ভূপাল আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু হয়।

কিন্তু আবার আসরে অবতীর্ণ হয় মামোলা বেগম। ওর মধ্যস্থতায় স্থির হয় রাহতগড়, পাথরি এলাকা সুলতান মহম্মদের অধীনে থাকবে। বিমাতা মামোলা বেগম নাবালক নবাব ফৈয়াজ মহম্মদকে সামনে রেখে রাজ্যপাট চালাতে থাকে।

নূতন নাবালক শাসককে ভয় দেখায় সিন্ধিয়া। রায়সেন ও সিহোর পরগনার বেশ খানিকটা অংশ নবাবের হস্তচ্যুত হয়। নূতন করে সন্ধি হয়। খেসারত দিতে হয় নবাবকে।

বড় হয়ে, ক্রমে ফৈয়াজ মহম্মদ খানও শক্ত মুঠি ধরেন। রাজ্যসীমা বর্দ্ধনে মন দেন। এক রাতে হঠাৎ করে, ঝড়ের বেগে গিয়ে রায়সেন কেল্লা ফতে করেন। নূর আলি খান নামে যে কেল্লাদার ছিল রায়সেনে সে পালিয়ে বাঁচে। এই প্রথমবার ভূপালের নবাবের অধীনে আসে রায়সেন দুর্গ। এতে অবশ্য দিল্লীর সুলতান ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ফৈয়াজ মহম্মদ ওকে মিছে কথা বলে বোঝাতে সক্ষম হন যে কেল্লাদার স্বাধীন হবার চেষ্টা করায় উনি এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর সঙ্গে বাদশাহকে তুষ্ট করতে উপঢৌকন পাঠান। বাদশাহ খুশি হয়ে ফৈয়াজ মহম্মদের দুর্গ অধিকারকে স্বীকৃতি দেন।

এই সময় ইংরেজরা ছাড়াও, আরও এক বিদেশী পারস্যের আহমদ শাহ আবদালি ভারতের উত্তর প্রান্তকে কাঁপিয়ে তোলে। ওকে প্রতিরোধ করতে যে বিশাল মারাঠা বাহিনী দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ভূপালেও তার তাঁবু পড়ে। চারদিন অবস্থান করে নবাবের আতিথ্য গ্রহণ করে মারাঠা বাহিনী। নবাব আতিথেয়তার ত্রুটী করেননি। মারাঠীরা নবাবকে অর্থ সাহায্য দেয় যাতে অন্ততঃ কয়েক হাজার পাঠান সৈন্য মারাঠাদের সঙ্গে যেতে পারে চরম লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে।

কয়েক বছর পর, ফের বাজীরাওয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রাও সিহোর হয়ে দিল্লীর পথে এগোয়। ভূপালের নবাবকে সংবাদ পাঠান হয়, নবাবও যেন ওর সঙ্গে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন।

অসামান্য তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিণী মামোলা বেগম পুনরায় আসরে উপস্থিত

হয়। নবাব ধর্মভীরু। প্রজারা ঠাট্টা করে সন্ত নবাব বলে। মামোলা বেগম ওকে বুদ্ধি দেয়, ওর যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে না। ছোট ভাই ইয়াস মহম্মদকে পাঠিয়ে দেয়। নবাব খবর পাঠান—ওঁর পক্ষে এখন দিল্লী যাওয়া সম্ভব নয়।

মারাঠা সেনাপতি ক্রোধে লাল হয় নবাবের ধৃষ্টতায়। মারাঠা সন্তান কড়া পত্র পাঠায়...আহমদ শাহ আবদালিকে ভারত থেকে বিতাড়িত করে, পরে নবাবকে শায়েস্তা করবে। কিন্তু ভাগ্য মারাঠাদের বিরুদ্ধে। মামোলার গণনা সঠিক প্রমাণিত হয়। নবাবকে শাস্তি দেবার সুযোগ মারাঠাদের আর হয় নি। পানিপথের যুদ্ধে সব আশা নির্মূল হয়।

ইংরেজদের সাথে ছোটখাট সংঘর্ষ হলেও মারাঠারা কিন্তু চরম আঘাত পায় আহমদ শাহ আবদালির কাছে—পানিপথের যুদ্ধে।...নাদির শাহের উপযুক্ত শিষ্য আবদালির হাতে এমন পরাজয় হয় মারাঠাদের যে সে যুদ্ধে কম মারাঠা সৈন্যই জীবিত ছিল।...শিবাজীর হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। মারাঠাদের কোমর ভেঙ্গে যায়।

পানিপথ। এক আতঙ্কিত নাম হিন্দুদের কাছে।...এখানে বাবর, রানা সংগের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। আকবরের সাথে যুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বৈশ্য সন্তান হিমুর মস্তক খণ্ডিত হয়।...এর দু'শ বছর পরে মারাঠাদের পর পর দুবার পরাজিত হতে হয় এখানে। প্রথমে আবদালির হাতে, শেষবার ইংরেজদের হাতে।...ইংরেজরা মারাঠাদের স্বপ্ন চুরমার করে দেয়।

পুনার শক্তি ক্ষয় হবার পর মারাঠারা বরোদা, নাগপুর, ইন্দোর, গোয়ালিয়রে এক একজন পেশোয়ারের নেতৃত্বে শাসন চালাতে থাকে। এতোতেও মারাঠারা কিন্তু ভূপালের উপর ছোটখাট উৎপাত চালাতে ছাড়েনি। তবে যতদিন ফৈয়াজ মহম্মদ খান জীবিত ছিলেন, খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ভূপাল রাজ্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে আর পিণ্ডারী দস্যুদের অত্যাচারে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে ইতিহাসের চাকা আর একবার উল্টো দিকে ঘোরে ভূপালে।

২০

ফৈয়াজ মহম্মদ মারা গেলেন নিঃসন্তান অবস্থায়। ছোট ভাই হায়াৎ মহম্মদ এ সুযোগ ছাড়বে কেন? গদীতে বসে তরবারি বাগিয়ে। কিন্তু মৃত নবাবের পত্নী

বহুবেগমও ছাড়বার পাত্রী নয়।...আমি কেন গদীতে বসতে পারবো না? সরবে দাবী তোলে বেগম সাহেবা।

আবার সেই সুদেহী, দীর্ঘ আয়ুর অধিকারিণী, অমিত তেজস্বিনী মামোলা বেগম এগিয়ে এসে হাল ধরে। ভাবি ও দেওরের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। স্থির হয় বহুবেগম গদীতে বসবে আর হায়াৎ মহম্মদ ওকে সাহায্য করবে। কিছুদিনের মধ্যেই দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায়, হায়াৎ মহম্মদ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করে।

কিন্তু শীঘ্রই নবাবকে যেন খোলের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। নবাব নিরালায় থাকে, কট্টর নামাজী হয়ে ওঠে। রাজকার্যের চেয়ে দিনে দশ ওকত নামাজ ওয়াদা দিতেই দিন কেটে যায়। ওর এক পালিত পুত্র, হিন্দু তবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত, ফওলাদ খানকে সবার অমতে মন্ত্রী বানায়। ঐ সময় কর্ণেল গডার্ড বাঙ্গলা থেকে বম্বের পথে ভূপালে আসেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য উনি যাচ্ছেন। ফওলাদ খান ওদের খুব সাহায্য করে। রসদ ও অশ্ব উপঢৌকন দেয়।

ফওলাদ খানের ভাগ্য কিন্তু ফওলাদী নয়। আততায়ী দ্বারা নিহত হয় ফওলাদ। গুজব রটে মামোলা বেগমই ওকে মহলের ভিতর গুপ্ত হত্যা করান। মামোলা শুরু থেকেই ওর ঘোর বিরোধী ছিল। পুনরায় মামোলা বেগমেরই উপদেশে নবাবের একজন সামান্য কর্মচারী, যিনি ছিলেন আর এক ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ সন্তান, ছোটে খানকে উজীরের পদ দেওয়া হয়। ছোটে খান জানে, পাশের রাজ্যে সিন্ধিয়ারাই বেশী জ্বালাতন করে, তাই ওদের সাথে সদ্‌ভাব রেখে চলাই শ্রেয়। হঠাৎ যেমন রাজপাটে মামোলা বেগমের উদয় হয়েছিল তেমনি সে আশি বছর বয়সে একদিন চুপচাপ চলে গেল। মামোলা কোন সন্তান রেখে যেতে পারে নি মায়ের গুণগান করার জন্য।

এই সময় ভূপালের গদীর লড়াই আবার তীব্র হয়। দুর্বল শাসক হলে যা হয়। শাসকতো তরবারি ছেড়ে, মসজিদেই বেশী সময় কাটান। শত্রুরা এর সুযোগ নেবে বৈকি?

ভূপালের দশ মাইল দূরে, ফান্দাতে উজীর ছোটে খান আর ভূপালের ভূতপূর্ব প্রথম নবাব দোস্ত মহম্মদের এক নাতি শরীফ মহম্মদের সাথে দারুণ যুদ্ধ হয়। শরীফ মহম্মদকে ভূতপূর্ব নবাবের পত্নী বহুবেগম উস্কিয়েছে—এতদিন দোস্ত মহম্মদের অবৈধ সন্তান ইয়ার মহম্মদ খানের বংশধর রাজত্ব করে এসেছে, এবার

তার গদী দখল করার সময় এসেছে। শরীফ মহম্মদ লড়াইতে হেরে যায়। ওর সন্তান উজীর মহম্মদ কোন রকমে পালিয়ে বাঁচে। এই উজীর মহম্মদই পরে নূতন করে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেয় ভূপালের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে।

অল্প সময়ের ভিতর মন্ত্রী ছোটে খান রাজ্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করে। রাজকোষ স্ফীত হয়। সামান্য চল্লিশ বছর বয়সে মন্ত্রী ছোটে খান মারা যায়। কিন্তু এমন কাজ করে যায় যা লোকে চিরদিন মনে রাখবে। ওকে মন্ত্রী পদে নিয়োগে অনেকখানি নির্ভর করেছিল মামোলা বেগমের দূরদৃষ্টির উপর। নির্বাচন যে সঠিক হয়েছিল তা প্রমাণিত হয় ওর কাজকর্মে।

যবে থেকে রাজা ভোজ ভূপালে সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধেন, তবে থেকে তাল-তালাবের শহর নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হয় ভূপাল। নবাবেরা ক্রমে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যান ভূপালকে। এখানের সুউচ্চ মিনার বিশিষ্ট মসজিদ সারা ভারতে বৈশিষ্ট্যের দাবি করে।...মন্ত্রী ছোটে খান একে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। বড় তালাবের বাঁধ যদি রাজা ভোজের মন্ত্রী কল্যাণ সিংহ বানান, ভূপাল নবাবের মন্ত্রী ছোটে খান, ছোট তালাবের উপর পুল পোক্তা নির্মাণ করেন। ফলে, দুর্গ প্রধান শহর আর ঝিলের উপর বাসিন্দাদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

রাজশক্তিকে বজ্র মুষ্টিতে তরবারি ধরতে হয়। কিন্তু নবাব হায়াৎ মহম্মদ আঙ্গুলে মালা ঘুরিয়ে শুধু খোদাকে ডাকেন। এতে কি আর রাজ্য পরিচালনা চলে? আত্মার মুক্তির জন্য আল্লাকে ডাকা যায়, কিন্তু তাতে রাজপাট চালানো যায় না।

ছোটে খানের পুত্র উজীর হয়ে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বিফল হয়ে নাগপুর পালায়। ওর প্ররোচনায় রঘুজী ভোঁসলে নাগপুর হতে এসে রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী হোসেঙ্গাবাদ কেল্লা দখল করে। তবে আর বিশেষ উৎপাত করে না। নর্মদা নদীর এপারে আসে না। কিছুদিন পর অবশ্য ফেরৎ চলে যায়।

এই সুযোগে উজীর মহম্মদ আবার একবার ভূপালের নবাবের কৃপাপাত্র হবার প্রচেষ্টা করে। নবাবও ওকে মন্ত্রী বানাতে চান। কিন্তু উপপত্নী আসমত বেগম ও পুত্র গাউস মহম্মদ বিরোধিতা করে। আর একবার নবাবের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। সবার বিরোধিতা সত্ত্বেও, রাহতগড় কেল্লার অধিকারী নবাবের আত্মীয় মুরাদ মহম্মদকে মন্ত্রী পদে বসানো হয়।

মুরাদ মন্ত্রী হয়ে দুর্মদ, বিভীষিকার রূপ ধারণ করে। এক মাসের ভিতর ওর অত্যাচারে চতুর্দিকে হায় হায় রব ওঠে। মুরাদ এমন কি আসমত বেগমকে পর্যন্ত হত্যা করে। ওর ধৃষ্টতা চরমে ওঠে। এরপরে দৃষ্টি পড়ে গাউস মহম্মদ ও

উজীর মহম্মদের উপর। উজীর মহম্মদ তখন কেল্লা গিন্নোরগড়ে। পিণ্ডারী সর্দাররা ওর সহায়ক। কাজেই মুরাদ বিশেষ সুবিধা করতে পারে না।

নবাব পুত্র গাউস মহম্মদ খান বৃদ্ধ এবং তেমন কাজের লোক নয়। তাই বৃদ্ধ নবাব কোলে খান নামে এক প্রভাবশালী সাহসী জায়গিরদারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যদি মুরাদকে শায়েস্তা করতে পারে, তবে ওকে উজীর বানানো হবে— আশ্বাস দেন।

উজীর মহম্মদ ও কোলে খানের মিলিত শক্তিকে মুরাদ ভীতির চোখে দেখে। মুবাদ সিরোঞ্জের মাবাঠা শাসকের শরণাপন্ন হয়। মারাঠা শাসক প্রতিদানে ইসলাম নগরেব কেল্লা চায়। ফৌজ নিয়ে ধেয়ে চলে ওদিকে। কিন্তু দুর্গ হাতে আসে না। ইয়ার মহম্মদের বৃদ্ধা কিন্তু তেজস্বী কন্যা সতি বেগম, কেল্লাদারকে দিয়ে দারুণ ভাবে গোলা বর্ষণ করান। মুরাদ পালিয়ে যায়। দুর্গ প্রাচীরের পাশে দারুণ যুদ্ধ হয়। মারাঠারা হঠাৎ যুদ্ধে খান্ত দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায় এবং যাবাব সময় স্বয়ং মুরাদকে বন্দী করে নিয়ে যায়, অসমাপ্ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি করে। হায়রে ভাগ্য! যে ভয়ঙ্কর মুরাদ ধেয়ে চলছিল কোন কিছুকে তোয়াক্কা না কবে শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুই ওকে বাঁচায়। মুদ্রা কোথায় যে মারাঠা সর্দারকে দেবে?

এরপর নবাব কিন্তু উজীর খানকে মন্ত্রী বানায়, কোলে খানকে নয়। ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। উজীর মহম্মদ কালক্ষেপ না করে, রায়সেন জেলার যে অংশ মারাঠারা দখল করেছিল এবং এমন কি কোলে খানের জায়গীরও হস্তগত করতে দেরী করে না। মন্ত্রীর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে নবাব পুত্র গাউস মহম্মদ শঙ্কিত হয়। ও পিণ্ডারী দস্যু সর্দারের সহায়তা চায়।

এ সংবাদ শুনে, উজীর মহম্মদ দশ মাইল দূরে, ইসলামনগর দুর্গ হতে ছুটে আসে। কিন্তু সুবিধা হয় না। ভূপাল ত্যাগ করে, রায়সেনের দিকে চলে যায়। কিছুদিন পব নবাবের মৃত্যু হয়। আসলে উজীর মহম্মদই রাজ্যের বিকল্প শাসক হয়ে উঠেছিল। এবার সে আরও সক্রিয় হয়।

পিতার পর, পুত্র গাউস মহম্মদ গদীতে বসে। কিন্তু বুকের ভিতর ভয় দানা বাঁধে। উজীর মহম্মদও ভূপালে এসে আসর জমায়। পিণ্ডারী সর্দারের সহায়তায় ফতেগড় দুর্গ দখল করে।

নবাব গাউস মহম্মদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। উজীরই নবাব। উজীর সম্মান পূর্বক নবাবকে রায়সেন কেল্লায় যেতে বলে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। মানে ওকে

বুঝিয়ে দেয়, এরপর বাকি জীবন ওখানেই কাটাতে হবে। কি আর করবে? মনঃক্ষুণ্ণ হলেও, প্রাণের মায়ায় তাই করে নবাব। বারাদরিতে বসে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। উপায় আর কি? নবাবী করা আর হল না।

এরপর থেকে ভূপালের নবাবী ধারায়, মাথার উষ্ণীষ বদলে গেল। সত্যিকারের উজীর, উজীর মহম্মদ বাদশা হয়ে গেল। মন্ত্রী রাজা হল। নূতন বংশধারার প্রবর্ত্তন হল। বলা চলে যে দোস্ত মহম্মদ খানের বিবাহিত পত্নীর সন্তানের রক্ত ধারার সাথে সম্বন্ধ রাখে, এমন বংশের পত্তন হলো। এতদিন পর ভাগ্যের চাকা ঘুরলো। অবশ্য মুসলমান সম্রাটদের ইতিহাসে এমন উদাহরণ ভূরিভূরি।

সিন্ধিয়া তখনও ইসলামনগর অধিকার করে রেখেছে। ওদের স্থানচ্যুত করার সব রকম প্রয়াস চালায় উজীর মহম্মদ। ইংরেজদের শরণাপন্ন হয়। ইংরেজ মারাঠাদের সাথে অকারণ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় না। নয় মাস পর অবরোধ তুলে নেয় মারাঠারা। রাজ্যে শান্তি দেখা দেয়। জীবনের শেষ কয়দিন নিরুপদ্রবে কাটায় উজীর মহম্মদ।

২১

গদীতে বসে উজীরের পুত্র নজর মহম্মদ। অতীতের নবাব গাউস মহম্মদ বিলাপ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। মসনদ যখন পেল না, তখন বর্ত্তমান নবাবের সঙ্গে সম্বন্ধ পোক্ত করতে চায়। নিজ কন্যা গোহর বেগমকে নজর মহম্মদ খানের সঙ্গে বিয়ে দেয়। গোহর পরে কুদেসিয়া বেগম নামে খ্যাত হয়।

নজর মহম্মদ ওর পিতার আজন্মের ইচ্ছা পূরণ করে গদীতে বসে। ইংরেজদের সাথে চুক্তি করে। পিণ্ডারী সর্দারদের দমন করে। ইংরেজরা অতঃপর যখন খুশি ভূপালের উপর দিয়ে দক্ষিণমুখী অভিযান চালাতে পারবে।

নজর মহম্মদ শক্ত মুঠিতে শাসন চালায়। সিন্ধিয়ারা যে ইসলামনগর দুর্গ অধিকার করে রেখেছিল তা নজর মহম্মদের হাতে ফিরে আসে। এই উপলক্ষে উৎসব পালিত হয়। জসন মানানো হয়। বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিভূ বসে সিহোরে।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। শিকার করতে গিয়ে নবাব নজর মহম্মদ নিজেই শিকার হয়। মারা যায় দুর্ঘটনায়। নিকট আত্মীয় জাহাঙ্গীর খান গদীতে বসে। ভূতপূর্ব নবাব নজর মহম্মদ খানের কন্যা সেকন্দার বেগমের নিকা হয় জাহাঙ্গীর মহম্মদের সঙ্গে। এসব ঘটনা পরের। এর আগে জল অনেক ঘোলা হয়।

নজর মহম্মদের অকাল মৃত্যুতে, ওর স্ত্রী কুদেসিয়া বেগম গদীতে বসেন। ইংরেজ রাজনৈতিক এজেন্টের মধ্যস্থতায় ঠিক হয়, ওর কন্যা সেকন্দার বেগমের স্বামী ভবিষ্যতে গদীতে বসবে।

মামোলা বেগমের পর, কুদেসিয়া বেগম আর এক নারীচরিত্র ভূপালের গদীতে বসে চমক সৃষ্টি করে এবং যা দৃঢ়চেতা পুরুষের চেয়ে কম নয়।

মুনির মহম্মদ খানের সঙ্গে সেকন্দার বেগমের বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। কুদেসিয়া বেগম অভিযোগ করে, মুনির মহম্মদ নপুংসক। ফলে মুনির মহম্মদ বিদ্রোহ করে পুরুষত্ব জাহির করতে। ওকে ছোটখাট জায়গির দিয়ে শান্ত কবা হয়। শেষে ঠিক হয়...বড় ভাই না হোক, ছোট ভাই জাহাঙ্গীর মহম্মদ খানের সঙ্গে সেকন্দার বেগমের বিয়ে হবে। বিয়ের তারিখ পরে ঠিক করা হবে।

কুদেসিয়া বেগম কিন্তু এরজন্য কোন তাড়াহুড়া করে না। দক্ষতার সঙ্গে বাজ্য পরিচালনা করতে থাকে। এদিকে সময় বয়ে যায়। হবু জামাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদ বিয়েতে দেরী দেখে ইংরেজ এজেন্টের নিকট দরবার করে। ফলে, ইংরেজ পুরুষ সাগর থেকে ভূপালে এসে হাজির হয়। যতক্ষণ না বেগম, কন্যার বিয়ে দিচ্ছেন—ততক্ষণ উনি ভূপাল হতে যাবেন না। ফলে, কুদেসিয়া বেগমকে নরম হতে হয়। নিকা সম্পন্ন হয়। দলিলে স্বাক্ষর করে জাহাঙ্গীর মহম্মদ,...কুদেসিয়া বেগমকে বাজকর্ত্রী বলে মানবে। আর কোন বিয়ে কববে না। কোন উপপত্নী রাখবে না বেগম কিন্তু কোন পর্দা মানবে না।

কিন্তু বিয়ের পর, জামাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদ ক্রমে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা শুরু কবে। শাশুড়ী ও পত্নী, তুজনের সঙ্গেই ধীরে ধীরে মনোমালিন্য বাড়তে থাকে। জামাতা যাতে ভূপালের গদী না দখল করে, তাই কুদেসিয়া বেগম প্রজাদের সামনে কখনও ঘোড়ায় চড়ে, কখনও সুদৃশ্য পাল্কিতে চড়ে, নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এমন কি বর্শা ছোড়া পর্যন্ত বাদ যায় না। পুরুষদের সাজসজ্জা করতেও পিছ পা হয় না।

জামাতা কিছুদিন চুপ করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সেকন্দার বেগমকে হুঁশিয়ার করে। কারণ, শাশুড়ীকে তো আর কিছু বলতে পারে না।

—বেগম, তুমি মলমলের মিহি কুর্তা পরে মহলের বাইরে যেতে পারবে না।

খিল খিল করে হেসে দেয় খুবসুরত সেকন্দার বেগম। যৌবনের উৎফুল্লতা শরীরে খেলে যায়, ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু, পরে, একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই

বলে—নিকার চুক্তি মনে নেই ? তা' তো আগেই মা লিখিয়েছেন—তুমি এতে কোনরূপ বাধা দেবে না। ভুলে গেছ নাকি ?

উত্তর শুনে, পাঠানের মনও কঠিন হয়। আর তা' প্রকাশ পেতেও দেরী হয় না। রাতে হিমেল হাওয়ায় বধূকে বুকের পাশে টেনে আনার বদলে, ক্রোধের বশে মুক্ত তরবারি নিয়ে পালঙ্কের দিকে এগিয়ে যায় জাহাঙ্গীর মহম্মদ।...কিন্তু নারী চতুরা। কিছু আঁচ করে থাকবে আগে ভাগেই। ঘুমের ভান করে ছিল সেকন্দার বেগম। স্বামীব হাত ধরে ফেলে। ফলে তরবারিতে আঘাত লাগে। চার জায়গায় কেটে যায়। রক্তাক্ত হয় বিছানা।

...সংবাদ।...তাও জামাতা ও রাজ দুহিতার মধ্যে বিবাদ। অসাধারণ তো বটেই ! তরবারিও ব্যবহৃত হয়েছে মহলের ভিতর। খবর পেয়ে কুদেসিয়া বেগম অস্থির হয়। ইংরেজ সরকারের প্রতিভূ ছুটে আসেন মধ্যস্থতা করতে। ঠিক হয় মা ও মেয়ে ইসলামনগর কেল্লায় থাকবে। আর জাহাঙ্গীর মহম্মদ থাকবে ভূপালের গদী অধিকার করে। কাগজ-কলমে বিচ্ছেদ না হয়েও, স্বামী, স্ত্রী হতে দূরে রইলো। ওখানে থাকা কালে, কন্যা প্রসব করে সেকন্দার বেগম। কখনও বাইরে কোথাও গেলে স্বামী স্ত্রীতে দেখা হত। কিন্তু শাশুড়ী জামাতাকে কখনও সুনজরে দেখেনি। 'নূতন' নামে এক বাইজীকে খাড়া করে, কুদেসিয়া বেগম ওকে দিয়ে বলাতে চায় যে জাহাঙ্গীর খান নপুংসক। বদনাম রটিয়ে গদী চ্যুত যদি করা যায়—যা নবাবের বড় ভাইয়ের বেলায় হয়েছিল। জট পাকাতে চায় কুদেসিয়া।

কিন্তু মহলের বাইরে এসে এ কথা বলতে অস্বীকার করে বাইজী। কথাটা রটনা হতেই, কুদেসিয়া বেগমের সঙ্গে জামাতার তিক্ততা বেড়ে যায়। রাজশক্তি হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে কুদেসিয়া বেগম ক্রমে যেন মস্তিষ্ক-বিকৃত নারীর ন্যায় আচরণ করতে থাকে। ক্ষুব্ধ বাঘিনীর মত জ্বলে ওঠে। সবাই দূরে থাকে ওর কাছ থেকে।

নবাবের নিকট বেগম সেকন্দার থাকে না। উল্টে টঙ্কের শাসকের পুত্র ওসমান খানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও মাখামাখি রাজ্যে প্রজাদের মনে বিরক্তি জন্মায়। লোকে কথা বলাবলি করে।

কিন্তু ভগবানই মুক্তি দেন—একদিকে মা ও মেয়েকে অন্যদিকে জামাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদকেও। জামাতার পেটে হজমের গোলমাল দেখা দেয়। ডৈক

বলে অত্যধিক অত্যাচারের ফল। চিকিৎসা বিফল হয়। হাকিম কিছু করতে পারে না। সামান্য ২৭ বছর বয়সেই জাহাঙ্গীর খানের মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীরের সামান্য সাত বছর রাজত্বকালে, ইংরেজের সাথে তার সম্বন্ধ গাঢ় হয়। এমন কি বুন্দেলারা যখন বিদ্রোহ করে, বৃটিশকে সাহায্য করতে দেউরী পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল জাহাঙ্গীর।

ছোট তালাবের উপর পুল পোক্তা, রাজধানীর সাথে ওপারের যোগসূত্র। ছোটে খানের সৃজন শক্তির ফল। নবাব তালাবের সৈন্য ছাউনী সরিয়ে নেয়। বুঝতে পারে পাঠান সৈন্যদের উৎপাতে ভূপালে ঠিকমত বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠছে না। বাইরে থেকে ব্যবসায়ীদের আসতে আমন্ত্রণ জানান হয়। ভূপাল-বাসিন্দাদের সুন্দর ঘরবাড়ী বানাতে উৎসাহিত করা হয়। সুদৃশ্য অট্টালিকা ঝিলের তীরে শোভা বর্দ্ধন করে।

নবাব হঠাৎ পরলোক গমন করে। মৃত্যুর দিন, নবাবের অসুস্থতার খবর পেয়ে কুদেসিয়া বেগম এবং পত্নী সেকন্দার বেগম শেষ দর্শন করতে আসে। নবাব তখন মৃত। কিন্তু একমাত্র কন্যার বয়স মাত্র সাত। ফুটে ফুটে শাহজাহান বেগম—শিউলি ফুল। রাজ্য পরিচালনার কঠিন বিষয় ও কি জানে? তবুও ইংরেজ সরকার ওকে গদীতে বসান এবং ওর মা সেকন্দার বেগমকে নাবালিকার অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করেন।

২২

অল্প বয়স। এবং বিবাহের পর, বহু সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে, বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেকন্দার বেগম। বাস্তব বুদ্ধির অভাব হয় না ওর। ওর সময় ভূপালের প্রচুর উন্নতি সাধন হয়। জামা মসজিদ ওর প্রচেষ্টার এক নিদর্শন। শোনা যায় হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে পরিবর্তিত করা হয়। অন্য দেশীয় রাজাদের মত সেকন্দারও সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সহায়তা করে সৈন্য সাহায্য পাঠায়। ব্যাপারটা অল্প কথায় বলে শেষ করা যাবে না।

ব্যারাকপুরের সূত্র ধরে, সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জনসাধারণের রোষ ফেটে পড়ে। সাধারণ মানুষের সাথে, রক্তের আহুতিতে, বহু রাজাও গোপনে যোগ দেন এবং সাহায্য করেন পরোক্ষে। বৃটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ফেটে পড়ে সর্বত্র।

ভূপাল রাজ্যেও, ফজল মহম্মদ ও আদিল মহম্মদ খান ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্রোহের ধ্বজা

উড়িয়ে দেয়। কয়েকজন জায়গিরদারও ওদের গোপনে সহায়তা করে। সিহোরে বৃটিশ রাজনৈতিক অধিকর্তা মেজর রিচার্ড ও অন্য বিশ জন অফিসার পালিয়ে জান বাঁচায়। বিদ্রোহীরা ছাউনী দখল করে।

সেকন্দার বেগমের উপর চাপ আসে। মোল্লরা, এমন কি ওর মা কুদেসিয়া বেগম উপদেশ দেয় বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে। কিন্তু না, সেকন্দার বেগম অটল। বরং মাকে হুঁশিয়ার করে, ওর খাস তালুকে যেন কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় উনি না দেয়। নিজে ইংরেজদের সহায়তা করবে ঠিক করে। প্রত্যেক জায়গির হতে সৈন্য জোগাড় করে সাগর ও বুন্দেলখণ্ডের দিকে পাঠায়।

প্রথম কয়েক মাসতো খান ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ভূপাল রাজ্যে। কিন্তু কিছুদিন পরে হিউস রোজ কোন রকমে এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হয় সিহোরে, নবাব সৈন্যের সহায়তায়। ১৪৮ বিদ্রোহীকে গুলি করে মারা হয়। মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

রাহতগড়ে এক খান ভ্রাতাকে অতর্কিতে দুর্গের চারিদিকে ঘিবে ফেলে ইংরেজ সেনাপতি। ফজল মহম্মদ পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। সেনাপতি ওঁকে রাহতগড় কেল্লার প্রধান ফটকে ফাঁসী দেয়, জন মানসে ত্রাস সৃষ্টি করতে। অন্য ভাই আদিল মহম্মদ বাকি সৈন্যদের নিয়ে পলায়নে সক্ষম হয়। ঝাঁসীতে গিয়ে তাঁতিয়া টোপের সাথে মিলিত হয় রাণী - ক্ষ্মী বাঈয়ের আওতায়।

আদিল মহম্মদ কিছুদিন চুপচাপ থাকে। ফের সাঁচী, সিরোঞ্জে এসে হামলা করে। বৃটিশ ওকে ধরার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। বাসোদার ইংরেজ সৈনিক অধিকারী লে. রুম, আদিল মহম্মদ ও বক্সী আমানত খানকে এক বার্তা পাঠায়— আত্মসমর্পণের জন্য। আদিল মহম্মদ বার্তা পেয়ে ক্ষিপ্ত বার্তাবাহক ইংরেজ অফিসারের হাত, যাতে করে পত্র বয়ে এনেছে, সেই হাত কেটে ফেলতে বলে। ভয়ে ইংরেজরা ঘোড়া ছেড়ে জঙ্গলের পথে দৌড়ায়। চাচা, আপন জান বাঁচা।

পরে, ইংরেজ সৈন্যরা মিলিতভাবে আক্রমণ চালায়। কিন্তু চতুর আদিল মহম্মদ পালাতে সক্ষম হয়, যদিও ওর অনেক অনুগামী মারা যায়। সাগরের পাহাড় জঙ্গলে আর দুর্গম বেতবা নদীর অববাহিকা বিদ্রোহীদের সুন্দর আশ্রয় স্থল। বৃটিশ সরকার ওকে ধরার জন্য দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু কোনদিনই ওকে ধরতে পারে নি। কালের গর্ভে তলিয়ে যায় আদিল মহম্মদ চিরকালের জন্য।

তাজ্জব ব্যাপার এই যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কিন্তু একটি বৃটিশ নাগরিকও

মারা যায়নি ভূপাল রাজ্যে। ইংরেজ অফিসার খুশি হয়ে কলিকাতায় বড়লাটকে সংবাদ পাঠায়—এমনটি সারা ভারতে কোথাও হয়নি। কোন দেশীয় রাজা এমন ভূমিকা দেখাতে পারেনি। সেকন্দার বেগমের কঠোর অনমনীয় মনোভাবের জন্য এমনটি সম্ভব হয়।

বিশেষ রাজ দরবার বসে জব্বলপুরে। বড়লাট ক্যানিং নিজে উপস্থিত। বহু দেশীয় রাজারা উপস্থিত, সেকন্দার বেগমকে বিশেষভাবে ডাকা হয়। ওঁকে দরবারে সনদ দেওয়া হয়। রেবাসিয়া পরগনা ভূপালকে উপহার দেওয়া হয়। রেবাসিয়া পূর্বে ধারওয়ারের মারাঠা রাজার অধীনে ছিল।

যত প্রশংসাই অর্জন করুক, মানুষ তো আর অমর নয়। একদিন মৃত্যু এসে ৫১ বছর বয়সের সেকন্দার বেগমকে পরপারে নিয়ে যায়।

২৩

এরপর ভূপালের গদীতে নারীই বসে এসেছে পর পর।...বেগমই বেগম।...কুদেসিয়া বেগম।...তারপর কন্যা সেকন্দার বেগম।..তস্য কন্যা শাহজাহান বেগম ও তারপর সুলতান জাহান বেগম। এক নাগাড়ে রাজত্ব করেছে এরা।...দুলহারা, মানে জামাতারা রাজপ্রাসাদে আরামে দিন কাটিয়েছে। রাজ্য পরিচালনা...না না ওতে রুচি নেই। সেকন্দার বেগমের স্বামীর তিক্ত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে দীপ বর্তিকার কাজ করেছে।

বেগমরা নবাব হয়ে ভূপালের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। রাজা ভোজের কেল্লার পুরানো প্রাচীর ধরে, দোস্ত মহম্মদ খান যে নূতন রাজধানীর পত্তন করেন, ভূপালের বেগমরা তাতে সুন্দর সুন্দর কোঠি বানান। সরোবরের তীরে হাওয়া মহল তৈরী হয়। গড়ে ওঠে বাগিচা, ধর্মশালা বানায়। সেকন্দারী সরাই।

সেকন্দার বেগমের কন্যা শাহজাহান বেগম শাসনের ভার হাতে নিয়ে, রাজস্ব প্রথার কানুন সংস্কারে মন দেন।...টাঁকশাল স্থাপন করে, নূতন মুদ্রার প্রচলন হয়। এশিয়ার বিখ্যাত তাজুল মসজিদ ওঁর কৃতিত্বের এক নিদর্শন। সুন্দর স্থাপত্য। দিল্লীর জামা মসজিদের চেয়েও বৃহৎ করে পরিকল্পনা করেন।...রাজ্যে প্রথম স্কুলের পত্তন হয়। তখনকার গোঁড়ামির যুগে এটা ছিল এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই নারী শাসকের।...পূর্বে মামোলা বেগম, নবাবের বিবাহিতা পত্নী না হয়েও, তিন পুরুষ ধরে প্রতিপত্তির ছাপ তুলে ধরেন, সমান দাপটে। ধন্য নারী! নিঃসঙ্গ রমণীর অদম্য সাহস। অপূর্ব কর্মতৎপরতা আজও ওঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

ভারতের ইতিহাসের অঙ্গনে রাজস্থানে স্থাপত্যর উৎকর্ষ যেমন জয়পুর, উদয়পুর, চিতোরকে গর্বিত করে, তেমনি দিল্লী, লাহোর আগ্রাতে মুসলমান বাদশাহদের তৈরী শ্বেত ও রক্ত বর্ণের প্রস্তরের সৌধবলী আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে। ভূপালের অট্টালিকা, সৌধের নব নব রূপদান করাতে নবাব শাহজাহান বেগমের দান অপরিসীম।...মোগল যুগের কল্পনাবিলাসী সম্রাট শাহ্‌জাহানের মত, ভূপালের সম্রাজ্ঞী শাহ্‌জাহান বেগমও মার্বেল পাথরের তাজমহল নামে প্রাসাদ নির্মাণ করেন ভূপালে। আরও নির্মাণ করেন তাজুল মসজিদ, যাকে বলা চলে লাল পাথরের বিস্ময়। · সদর মঞ্জিলের ভিতর, দিল্লীর লাল কেল্লার দেওয়ানী আমের ছাপ সুস্পষ্ট। শিশমহলে মার্বেল পাথরের ছোট হীরা মসজিদের অপূর্ব কারুকার্য আজ ধুলোয় মলিন। কিন্তু তবু তা ঐতিহ্যবাহী।

বিখ্যাত তাজমহলের বাস্তুকারিতা যদি সেরাজ নামধারী ব্যক্তির মস্তিষ্কের কল্পনা ছিল, তবে ভূপালের জন্য আল্লাদিয়া নামে চিন্তাশীল শিল্পীর কল্পনা প্রসংশার দাবী রাখে। মোগল যুগে দিল্লী, আগ্রার সৌন্দর্যময় হর্ম্যরাজির বাস্তুকারবংশধরদের নবাব শাহজাহান বেগম ভূপালে ওঁর দরবারে স্থান দেন। ওঁরা ভূপালকে সুন্দরতর করে সাজাতে যত্নের ক্রটী করেন নি।

রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে মস্তিষ্ক চালনার সাথে সাথে হৃদয়ের কামনা বাসনাকে জলাঞ্জলি দেন নি শাহ্‌জাহান বেগম।·· প্রথম স্বামী মৃত। খুব দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ওর শারিরীক ক্ষমতা সম্বন্ধে। হজ যাত্রা শেষ করে ফিরে এসে হঠাৎ মারা যান।···কেমনে কাটে রজনী। তাই দ্বিতীয়বার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করেন শাহ্‌জাহান বেগম। অবশ্য মৌলবীরা এতে বাধা সৃষ্টি করে। বেগম শুধু একটু মিষ্টি হাসেন। ওঁর মনের দিকটা ওরা ভেবেছে কি ?

২৪

ভূপালের রাজগদীতে নারীরা নবাবী করলেও, স্বামী সুখ যেন দূর অস্ত তাদের পক্ষে। পুত্র সন্তান ছিল না বেগমদের। পতি লাভ হলেও, পতির অকাল মৃত্যুতে ওদের সুখ স্থায়ী হয় নি।

নির্জন রাত্রির রিক্ত শয্যা মনের গহনে দহন করতে থাকে শাহাজাহান বেগমকে। ভূপালের বিশাল সরোবরের তীরে হাওয়া মহলের জানালা দিয়ে উদাস দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ হয়। জলে হালকা কম্পনে আলোর ঝিকিমিকি

অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা হওয়া মুখে লাগে। বেগমের দেহে সৌন্দর্যের প্লাবন এখনও বিদ্যমান। কিন্তু মহলের শয্যা? সে তো শীতল।

...মনে পড়ে, যখন বাবা মারা যান, তখন শাহজাহান একেবারে শিশু। চাকরাণীর ক্রোড়ে শৈশব কেটেছে। রাজপ্রাসাদের পিছনে, আয়েস বাগে গ্রীষ্মকালে ফলভারে আনত বৃক্ষের মাঝে দিন কেটেছে। দুনিয়ার তামাম ফলের গাছে ভরপুর বাগিচা। এ গাছ, ও গাছের নীচে চাকরাণীর সাথে ফল পেড়েছে। বাগিচার ভিতর বিশাল ইন্দারা। সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে নামার ব্যবস্থা। জলের কাছে ছোট ছোট কামরার মতো করা। নিদাঘের উত্তপ্ত দিনে দেহকে সতেজ করতে, ইন্দারার অন্তঃস্থলে আশ্রয়স্থলে সময় কাটাবার ব্যবস্থা।

বিয়ের পর স্বামীর সাথে কত মধুর মুহূর্ত, এই তলঘরে কাটিয়েছেন শাহজাহান বেগম। কানামাছি খেলতে গিয়ে পা পিছলে বাউলির ভিতর পড়েছে। জলে পরিধেয় ভিজে গেছে। উপরে উঠতে গেলে ফের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে অশান্ত যুবক নবাব। কত না আনন্দের মুহূর্ত।

ভূপালের শাহাজীদের জন্য জামাতা পাওয়া যেন বিষম ব্যাপার। নিজের বাবার কথা মনে পড়ে। বিয়ে নিয়েও দরবার হয়েছে ইংরেজ সরকারের কাছে। তারপর গদীতে বসার পূর্ণ বয়স প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সেকন্দার বেগমকেই রাজ্য শাসন করতে দিয়েছে, আমৃত্যু।

নিজের বিয়ে নিয়েও কম হাঙ্গামা হয় নি। একদিন চিকের আড়াল থেকে, মা সেকন্দার বেগমের কথাবার্তা শোনেন শাহজাহান। ছোট কক্ষ। কখনও কখনও শাসনের কাজকর্ম এখান থেকেই করতেন মা। মীর মুন্সী সামনে দাঁড়িয়ে। সেকন্দার বেগম একটা সুগন্ধি পান মুখে পুরে, জিজ্ঞাসা করেন।

—কি খবর? কোন সংবাদ পেয়েছেন?

মীর মুন্সী দপ্তরের প্রধান। সব কাজের ভার ওর উপর ন্যস্ত। মাথা নিচু করে থাকে। কি জবাব দেবে, ভাবছে।

হুজুর অপরাধ নেবেন না। যেরকম আদেশ দিয়েছেন, সেরূপ ছেলেতো ভূপালে দেখতে পাচ্ছি না।

শাহজাদী শাহজাহানের উপযুক্ত বরের তালাশ চলেছে। কিন্তু কেউ সফল হচ্ছে না। নবাব সেকন্দার বেগমের মুখে একটু অস্বস্তি ফোটে। রাগও।

—ভূপালে কি ছেলে নেই?

—জী। নহী। ছেলেতো আছে। কিন্তু যেমন খানদানী ঘরের ছেলের কথা বলেছেন, তা পাচ্ছি না। রাজরক্ত ওদের ধমনীতে থাকা চাই।

খানিকক্ষণ চিন্তা করেন নবাব সেকন্দার বেগম। বুঝে উঠতে পারেন না কি করবেন।

—আপনি বয়স্ক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দিল্লী ও অন্য স্থানে পাঠান। রাজ্যে যদি ভাবী জামাতার যোগ্যতা সম্পন্ন ছেলে না পাওয়া যায়, তাহলে বাইরে থেকে তা সমাধা করতে হবে। শাহজাদীর কি তাই বলে শাদী হবে না?

এবার যেন মীর মুন্সী একটু বল পায়। হয়তো সমাধান বের করা যাবে।

যেমন আদেশ, তেমন কাজ। চারিদিকে লোকজন ছোটে—পাশের ও দূরের রাজ্যে। এ খবর পেয়ে, বহু হবু জামাতার দল, ভূপালে এসে ঘাঁটি গাড়ে। রাজ অতিথিশালায় আরামে দিন কাটায়। কিছু তৈমুর রাজবংশের ছেলেও এসেছে। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, যে কোন কারণে। হয়তো ঘরজামাই হয়ে থাকা পছন্দ করে না ওরা। অথবা নবাবেরও পছন্দ না হতে পারে। শেষে বিরক্ত হয়ে নবাব সেকন্দার বেগম গর্ভর্নব জেনারেলকে পত্র লেখেন।

অনেক চেষ্টা করেও, কোন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেল না। কাজেই বৃটিশ সরকার যেন কোন সাধারণ ঘরের উপযুক্ত ছেলেকে চয়ন করার অধিকার দেন। কিন্তু সে নবাব হবার অধিকার পাবে না। ভবিষ্যতে নবাব হবে শাহজাহান বেগম। বাকি সবরকম সুখ সুবিধা তাকে দেওয়া হবে। যতদিন না শাহজাহান বেগম একুশ বছরে পদার্পণ করে, ততদিন মা সেকন্দার বেগম রাজকার্য পরিচালনা করবেন।

ইতিমধ্যে দরবারেব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছয়টি হবু জামাতাকে বাছাই করে। নবাবের মাধ্যমে, ওদের নাম ধাম ইংরেজ সরকারকে পাঠান। কিন্তু এদের কাউকে পছন্দ হয় না নবাবের। পরে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে নবাবের পত্রে উল্লিখিত শর্তে সম্মতি দেন এবং জামাতা অন্বেষণের কাজ ত্বরান্বিত করতে বলেন। নবাব মীর মুন্সীকে ডেকে পাঠান।

যখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না, এবার তাহলে অন্য কোন সূত্রের সন্ধান করুন। ভাবুন, আর কি করা যায়।

মীর মুন্সী একটু বোকার মত নবাবের দিকে তাকায়। মানে, ওঁর কথা ঠিক ঠাহর করতে পারে না। মুখে পান। পিচের ঢোক গেলেন। নবাবের কথার উত্তর দিতে হবে যে।

—বুঝলেন না ?

নবাবের বিরক্তি স্পষ্ট ঝাঁঝালো স্বরে বোঝা যায়।

—যদি এমন ছেলে খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে ব্যবসায় রত অথবা চাকুরের মধ্যে খুঁজুন না।

এবার মীর মুন্সী একটু ভরসা পায়। ঘাড় নাড়ে। চেষ্টা করবে সেই মত। কুর্ণীশ করে চলে যায়। নবাব ওর দিকে তাকিয়ে দেখে। নিজেকে অসহায় অনুভব করেন। এতবড় রাজ্য, তবু কন্যার উপযুক্ত পাত্রের অভাব। সদর মঞ্জিল থেকে চিন্তিত মনে বের হয়ে আসেন।

একটা একটা দিন চলে যাচ্ছে আর নবাবের উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে চলেছে। প্রত্যহই প্রায় খবর নিচ্ছেন কতদূর কি হচ্ছে। ভিতরে অস্থিরতা বাড়ে। সেকন্দার বেগম শুধু নবাবতো নন, মা যে। তাই অস্থির হওয়া স্বাভাবিক।

রোদ পড়ে গেছে। সন্ধ্যা আঁচল বিছিয়েছে। মীর মুন্সী নবাবের দর্শন প্রার্থী। রঙ্গীন বটুয়া থেকে, পান বের করে মুখে পোরেন নবাব সাহেবা। দু' আঙ্গুলের মাঝে সুগন্ধি তামাক জিহ্বার উপর ছেড়ে দেন। ছোট্ট একটা ডিবে থেকে, অনামিকা আঙ্গুলের ডগায় চুন বের করেন। বটুয়ার দড়ি বন্ধ করে, কুর্তার পকেটে রাখেন। কুর্সিতে বসে আরামে পান চিবোতে থাকেন। মৌতাতে চোখের পাতায় ঝিমুনী নামে। মন মেজাজ খুশ আজ।

ভৃত্য বার্তা নিয়ে অন্দরে চলে যায়। চাকরাণীর মারফৎ খবর যায় খাস কামরায়, মোতি মহলের ভিতর, নবাব সাহেবা আরাম করছিলেন যেখানে। সংঘর্ষে ভরা জীবন ওঁর। স্বামী সঙ্গ-সুখতো স্বপ্নের মত ওঁর জীবনে। কয়েক বছর মাত্র পতি জীবিত ছিলেন। যৌবনেই বৈধব্য জ্বালা ভোগ করতে হয়েছে। ফুলের মতো মেয়ের মুখ চেয়ে সব সহ্য করেছেন—আর পর-পুরুষের দিকে হাত এগিয়ে দেননি, ঘোমটা সরাতে চাননি।

মীর মুন্সী বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। বেগম সাহেবা চিকের আড়ালে উপস্থিত।

—হুজুর আদাব।

—তা' কি সংবাদ ?

ঘরে বাতির স্তিমিত আলো। ধুপদান থেকে হালকা সুগন্ধ সারা কামরায় ঘুরছে। চামেলীর লতা জানালার পাশে দুলছে অল্প হাওয়া। ফুলের কুঁড়িগুলিও।

সু-সংবাদ আছে হুজুর। এবার যে ছেলেটির খবর পেয়েছি, আশা করি তাকে আপনার পছন্দ হবে। ও আপনার ফৌজে কাজ করে,—উচ্চ পদে। সুপুরুষ আর খুব বলবান।

—বটে। আপনার কথা শুনে, ছেলেটিকে দেখতে ইচ্ছা করছে। সু-সংবাদ তখনই হবে, যখন ওকে আমারও পছন্দ হবে।

—আপনি যদি হুকুম করেন, তবে পেশ করতে পারি।

—ওকে কি এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন?

—না, হুজুর। তবে ওর আত্মীয়কে ইংগিত দিয়েছি। কারণ, ওর পিতা জীবিত নেই। তবে কথাটা আপাততঃ খুব গোপন রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।

—বাঃ। বেশ করেছেন। ওর নাম কি?

—বক্সী বাঁকী মহম্মদ। নসরত জঙ্গ বলে ডাকা হয় ওর বাহাদুরীর জন্য। ভাল ঘরের ছেলে। বহুদিন ভূপালে আছে। ওর বাবাও বেগম সাহেবার অধীনে চাকুরী করতো।

—কাল সকালেই ওকে দেখতে চাই। নসরত জঙ্গ মানে যুদ্ধজয়ী। সৈন্য-দলের উপাধি। ওকে কিন্তু এমনভাবে আনবেন, যেন ছেলেটি আমার মনোবাসনা টের না পায়।

—জী, তাই হবে।

পরের দিন ফৌজী কুচ্‌কাওয়াজের সময়, সেকেন্দার বেগম ওকে দেখেন। সত্যিই স্বাস্থ্যবান, সুন্দর চেহারা—যেমন মীর মুন্সী বলেছে। ওর দিকে নবাব সাহেবা হাতের ইশারা করেন। মানে ছেলেকে পছন্দ হয়েছে। শাহজাদীর বিয়ে এর সাথে দেবেন মনস্থ করেন।

মীর মুন্সীও খুশি। বটুয়া থেকে এক সঙ্গে দুটো পানের খিলি মুখে পোরেন, তামাকও গলাধঃকরণ করেন। মাত্রাটা বেশী হয়। হোক। একটা বিরাট কাজ উদ্ধার হয়েছে। ইংরেজ পলিটিক্যাল অফিসারের কাছে চিঠি যায়, বিয়ের সম্মতি চেয়ে। কিছুদিন পর গভর্নর জেনারেলের সম্মতি পাওয়া যায়।

শুভ লগ্নে বিয়ে হয় ধুমধামের সাথে। সারা নগর রোশনাইতে ঝলমল করে। সদর মঞ্জিলকে সাজানো হয়। প্রজারা কয়েকদিন ধরে ভোজ খায়।

বিয়ের পর বৃটিশ সরকার সনদ ঘোষণা করে, বাঁকি মহম্মদ খানের উপাধি হ'লো নাজির-উদ্দৌলা ওমরাও দুলহা বাহাদুর। পঞ্চাশটি গ্রাম ও বার্ষিক

দশ হাজার টাকা জামাতার জন্য বরাদ্দ হয়। শাহ্জাহান বেগমের জায়গিরের কোন রদবদল হলো না।

এরপর জামাতাকে আর সৈন্যদলে কাজ করতে দেওয়া হয় না। তবে দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, মন্ত্রী একজন থাকেন। জামাতার জন্য দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদ সৃষ্ট হয়। মোতিমিদ-উল-মাহম বলে নামকরণ হয় মন্ত্রী পদটির। মন্ত্রীর কাজ নির্দিষ্ট হয় রাজ্যের আমদানী, কর আদায় ও বাৎসরিক সম্ভাব্য খরচের হিসাবের রূপরেখা তৈরী করা।

পতি পেয়ে মন ভরে শাহ্জাহান বেগমের। পতি শুধু সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল না, অসীম বলশালী বটে। তার প্রমাণ দেয় বহুরূপে।

ভূপালের চতুর্দিক অরণ্যে ঘেরা। কোথাও অনেক প্রকারের বন্য পশু পাওয়া যায়। কোথাও বাঘ। আবার কোথাও কোমল নয়না হরিণী। তড়িৎগতি নীল গাইও প্রচুর। চিকলোদের জঙ্গল থেকে নীল গাই বধ করে কাঁধে নিয়ে যখন তাঁবুর কাছে আনে দুলহা বাহাদুর, তখন শাহ্জাহান বেগমের চোখ বিস্ফারিত হয়। ....বিস্ময়ে..."হায় আল্লা" শব্দ মুখ থেকে বের হয়। অতো ওজনের জানোয়ার অনায়াসে কাঁধে তুলে নিয়েছে দুলহা বাহাদুর!

—তোমাকেও তুলে নিতে পারি। বলে, হাসতে হাসতে বেগমকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নেয় দুলহা বাহাদুর।

—ছাড়ো ছাড়ো পড়ে যাবো। কেউ দেখবে। লাগছে—

শাহ্জাহান বেগমের আকুতি। দুলহা বাহাদুরের হাসিতে বন চকিত হয়। পরে বধূকে মাটিতে নামিয়ে দেয়।

শাহী বাগিচায় জল তোলার জন্য যে চামড়ার ভিস্তি ব্যবহৃত হয়, তা দুটি ষাঁড়ে টানে। একবার বাঁকী মহম্মদ খান নিজেই টেনে তোলেন। শাহ্জাহান বেগম খুশিতে দুলহা বাহাদুরের হাত নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করে। অসীম শক্তিধরের পুরস্কার।

নবাব সেকন্দার বেগমকে দৈনন্দিন কার্যে সহায়তা ছাড়াও, দুলহা বাহাদুর প্রতিদিন দুই ঘণ্টা নানা প্রকারের ব্যায়াম করেন। এরপর আবার খাওয়ার ফিরিস্তিতে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। নাস্তাতে কুড়িটি ডিম, ক্ষীর। ভোজনের সময় কয়েকটি মুর্গি, ছোট একটি বকরা।

বিয়ের কয়েক বছর পর ফুটফুটে সুলতান জাহান কোলে আসে শাহ্জাহান

বেগমের। খুব উৎসব মানানো হয়। একুশ বছরে পদার্পণ করলেও, রাজ্য পরিচালনা মা সেকন্দার বেগমকেই করতে বলেন। মাকে বড় ভালবাসে যে।

সারা দেশে এরপর সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে। সিপাহী বিদ্রোহের লেলিহান শিখা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। যুবতী শাহজাহান বেগম, শাসনের অনেক সূক্ষ্ম দিক মার কাছ থেকে শেখেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার পর, সেকন্দার বেগম জব্বলপুর যান, বড়লাটের কাছ থেকে সনদ নিতে।

হাতির হাওদায় বসে, দুলে দুলে যাত্রা শুরু হয়। সঙ্গে যায় প্রায় তিন শত জন লশকর, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক। তাঁবু—বসার ও শয়নের। কার্পেট। পোষাকে ভরতি বড় বড় বাক্স। টাকার সিন্দুক খাজাঞ্চীর হেপাজতে।

জব্বলপুর থেকে কাফিলা যায় এলাহাবাদ। পরে বেনারস, জৌনপুর. অযোধ্যা, দিল্লী, আগ্রা। শেষে জয়পুরের মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করে, ছয় মাস পর ভূপালে ফেরেন সেকন্দার বেগম কন্যা জামাতা সহ।

কিন্তু ষোলশ' মাইল চলার ধকল সহ্য করতে পারেন না বেগম সাহেবা। অসুস্থ হন। হাকিম ও ইংরেজ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেকন্দার বেগমকে বাঁচাতে পারে না।

শাহজাহান বেগম ভেঙ্গে পড়েন। মা ছাড়া ওর যে কেউ নেই দুনিয়ায়। দিদিমা কুদেসিয়া বেগম তখনও বেঁচে। মাথায় হাত রাখেন, ভরসা দেন। রাজ্যের শাসন ভার হাতে তুলে নেবার জন্য উপদেশ দেন। উনি আছেন, ভয় কি?

২৫

মোতি মহলের শয়ন কক্ষে, নরম শয্যায় শুয়ে, আগ্রার দৃশ্য ভেসে ওঠে শাহজাহান বেগমের চোখের সামনে। মার সাথে যখন আগ্রায় যায়, দুনিয়ার তামাম চিন্তা করার জন্য মা ছিল। আজ ওকেই সব জিম্মেদারী নিতে হবে। যদিও স্বামী আছে, তবু তাজ তো ওর মাথায়।

আকবরাবাদ। আগ্রা। গ্রীক ভাষায় আগ্রা অর্থে দুর্গ। সত্যই, আগ্রা মানেই আগ্রা দুর্গ। যমুনার তীরে নগরের বুকে অসীম শক্তির আধার।...আর তাজমহল। —যা দেখে কবি সাহিত্যিক কল্পনার সাগরে ডুবে, সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব কাব্য, মহিমান্বিত করেছেন প্রেমের স্মৃতিসৌধকে।

কেল্লার ভিতর দেওয়ান-ই-আম। জেনানা বাগ। স্বরখানা অর্থাৎ গ্রীষ্ম-

কালের জন্য বিশেষ কামরার কল্পনা দেখে শাহ্‌জাহান বেগমের বুকে কম্পন সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ অতিথিশালা তৈরী করেন সম্রাট আকবর। গরমে ঠাণ্ডা থাকতো এই কামরা। শীতলের পরশ বুলিয়ে দিত।

আকবর ছিলেন লাল পাথরের ভক্ত। ফতেপুর সিক্রী থেকে শুরু করে, আগ্রার কেল্লা···সব লালে লাল।···আবার সম্রাট শাহ্‌জাহানের তৈরী সব কিছু ওঁর শুভ্র দাড়ির মত শ্বেত বর্ণের প্রস্তর দিয়ে গড়া। আকবরের তৈরী দেওয়ান-ই-আমের লাল পাথরের তৈরী দরবারের স্তম্ভকে, ছাদকে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে মুড়ে দেন তিনি। ···শুভ্রতার প্রতীক। তাজমহল তার শ্বেতবর্ণ-প্রীতির চরম প্রকাশ।

চিন্তার স্রোত বেগবতী হয় বেগমের। যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। সদর মঞ্জিলে তৈরী হয় শ্বেত পাথরের দরবার কক্ষ। শ্বেত পাথরের তৈরী ফোয়ারাও হয় প্রাণবন্ত।

মোগল সম্রাটদের অনুকরণে শাহ্‌জাহান বেগম সৃষ্টি করেন মীনাবাজার বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে। দুর্গের প্রাচীর ঘেঁসে সুদৃশ্য কাঠের দোকান তৈরী হয় কেবল নারীদের জন্য। কিন্তু হঠাৎ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয় মীনাবাজার। তাজুল মসজিদের উল্টো দিকে ফের নির্জনতা নেমে আসে। রাতের হিমেল বাতাসে খিল খিল হাসির শব্দ আর ভেসে বেড়ায় না।

এরপরও ফের তৈরী হয় পরী বাজার। পাকা দালান। পাথরের, একমাত্র প্রবেশ দ্বার। সর্বদা প্রহরী মোতায়েন। হাঁ শুধু পরীরাই...নারী দ্বারা পরিচালিত। ক্রেতা ও বিক্রেতা শুধু রমণীরাই। যেহেতু বোরখা পরিহিতা মহিলারা বিশেষ কোথাও যেতে পারে না, তাই নবাব শাহ্‌জাহান বেগম পরী বাজারের সৃষ্টি করেন। গরীব গৃহিণীরা কোথায় যাবে আনন্দ উপভোগের জন্য...তাই প্রয়োজন পরী বাজারের।

পরী বাজারের মধ্য স্থলে খানিকটা উঁচু জায়গা। বাজার করার অবসরে কেউ কেউ ওখানে সমবেত হয় গাল গপ্পোর জন্য। মজার আসর। শুধু কি কথা? কতো হাসাহাসি। শহরের অলি-গলির কেচ্ছা কাহিনীতে আসরে গমগম করে। কেউ বলে···নবাব আসছেন। অমনি সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একমাত্র প্রবেশ পথের দিকে।···শাহ্‌জাহান বেগম কখনও কখনও আসেন। পাল্কি হতে নামেন। প্রহরীরা পথ ছেড়ে দেয়। প্রত্যেক দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে দেখেন। মুচকী হাসি বিনিময় হয় নারী দোকানীদের সাথে। কিছু কেনা কাটা করেন। উপহারও নেন কারও কারও কাছ থেকে।

হায়রে, সে সময় চলে গেছে।...সে পরী বাজারও আজ শূন্য। কখনো কখনো চাঁদনী রাতে মনে হয় শূন্য পরী বাজারে দু'পাট্টার হালকা সর্ সরর্ শব্দ কি বাতাসে ভেসে আসছে ? হাওয়াতে যেন সুগন্ধির সুঘ্রাণ। পরীদের ফিস্ ফিস্ আওয়াজ যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পরীরা তো নেই—তবে... ?

রাজ্যের উন্নতির জন্য নানা সংস্কারের কাজ শুরু করেন শাহজাহান বেগম। পুরো রাজ্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয়। কয়েকটি মুখ্যালয় স্থাপনা করেন, যাতে প্রজাদের দৌড়ে কেবল রাজধানীতেই আসতে না হয়, বিচার লাভের জন্য।

বাঁকী মহম্মদ হজ যাত্রায় মক্কায় যান। বহু নরনারী সঙ্গী। হজ যাত্রা শেষ করে ফিরেই অসুস্থ হন দুলহা বাহাদুর। গুজরাতের বন্দরে পা রেখে মনে বল পান শক্তিধর বাঁকী মহম্মদ। জন্মভূমিতে ফিরে আশ্বস্ত হন। কিন্তু শুধু ঐটুকুই। বলবান হলেই, কেউ অমব নন দুনিয়ায়। শত চিকিৎসায়ও সুফল হয় না। ভূপালে ফিরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন দুলহা বাহাদুর...শাহজাহান বেগম চিৎকাব করে ওঠেন মোতি মহলে। সদর মঞ্জিলে নেমে আসে অন্ধকার।

মা হারা হয়েও দিন চলে যাচ্ছিল। এবার শক্ত বাহুর বন্ধনচ্যুত হ'তে হল। শিশু সন্তান সুলতান জাহানকে অাঁকড়ে ধরেন বেগম সাহেবা। অকালে সব শেষ হলো। জীবনে নেমে আসে শূন্যতা। মেবে গুলবদন বলে ডাকার কেউ নেই তাঁর এই দুনিয়ায়।

মা নেই...স্বামী নেই। কিন্তু তাই বলে তো বসে থাকলে চলবে না। শাসন-যন্ত্র চালনা করতে হবে। বাজ্য, প্রজা ও তার কল্যাণ সব কিছু ভাবতে হবে। ইংরেজ বড় কঠিন জাত। নবাব হলেও, পুরো অধিকার নেই। অধিকার সীমিত খরচের সীমাও বাঁধা। এর বাইরে গেলে, পলিটিক্যাল অফিসারের হুঁশিয়ারী আসতে কতক্ষণ ?

এবার বৃটিশের দরবার বসে কলিকাতায়। বিশেষ কারণ আছে এর। ইংলণ্ডের যুবরাজ আসছেন। কলিকাতা ভারতের রাজধানী। মুসলমান সম্রাটদের দিল্লীই ছিল নাভিস্থল। বর্মা, মালয়, আবার নীচের দিকে সিংহল—ইংরেজের রাজ্য পরিধীর মধ্যে আসে।

ভারতের বুকে ইংরেজ রেলের জাল বিছোতে শুরু করেছে। খানিকটা করে থাবলে থাবলে এগোচ্ছে রেলপথ। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার। দুই লৌহ শলাকার রেল। তার উপর ঢকর ঢকর ডিব্বা গাড়ী দৌড়ায়। গাঁয়ের লোকের

চোখে বিস্ময়। সিপাহী বিদ্রোহের পর আরও এর দরকার হয়েছে। যন্ত্র যুগের প্রসার। দ্রুতগতিতে ভ্রমণ। মানুষ আর বস্তু দুইই বয়ে নিয়ে যাবে ঝক্ ঝক্ করে। ঝট্ করে দূরত্ব কমবে।

ভূপাল রাজ্যের পাশ দিয়ে লৌহ পথ বম্বের পথে এগিয়ে গেছে। শাহজাহান বেগমও এগিয়ে আসেন। ইংরেজের রেল কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য দেন রাজ্য তহবিল থেকে। পঁচিশ লাখ। দশ লাখ কুদেসিয়া বেগমের তরফ থেকে। ইটারসী থেকে ভূপালের রেল সংযোজন করার জন্য এবং গোয়ালিয়রের সঙ্গে যোগ-সূত্র কায়েম করতে বড়লাট ক্যানিংহামের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লভ্যাংশ পাবে ভূপাল রাজ গদী।

শাহজাহান বেগম বড় কাফিলা নিয়ে ভূপাল থেকে নরসিংপুর আসেন ইটারসী হয়ে সড়ক পথে। সেখান থেকে জব্বলপুর রেল পথে। ফের গাড়ী বদল করে, ডাক রেল গাড়ীতে যাত্রা শুরু হয়। হাওড়ায় পৌঁছতে দু'দিন লাগে।

কলিকাতায় রাজ দরবার, দারুণ ব্যস্ততা। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক এসেছেন। সুরক্ষার দারুণ ব্যবস্থা কলিকাতার পথে পথে।

সারা ভারত থেকে রাজা, মহারাজা, নবাবরা একত্রিত এখানে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হতে তোপ দাগা হয় ওঁদের সম্মানে। আলিপুর অতিথিশালা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে ওঁরা চলেছেন। সন্ধ্যায় লাট ভবনের বিরাট কক্ষে খাস দরবার বসে। ঝাড়-লণ্ঠনের রোশনাই। আড়ম্বর সর্বত্র—সাজ সজ্জায়, ভোজনে আপ্যায়নে।

ভূপালের নবাব সাহেবার চোখে ঔৎসুক্য। অট্টালিকার বাহার। শ্রেণীবদ্ধ। বিলেতের অনুকরণে। বিশাল ময়দান। সবুজ সামিয়ানা। গঙ্গার ঘাটে চোঙা জাহাজ। ধোঁয়া বের হচ্ছে। জাহাজের খোলে সুদূরের পসরায় ভরা। পথে লোকের হাতে বিরাট তালপাতার ছাতা, রোদ থেকে বাঁচার জন্য। পালকী চড়ে সওয়ারী নিয়ে কাহার হেঁকে চলেছে প্রশস্ত রাজপথ ধরে। যাদের ট্যাঁক গরম, তারাই পাল্কী চড়ে।

শাহজাহান বেগম টাঁকশাল দেখেন। থিয়েটারেও সময় কাটান। মন খুশিতে ভরা। মিউজিয়াম দেখেন—বিস্ময় লাগে। ওখান থেকে ফেরার পথে এক ব্যক্তির সাহিত্য জগতে খুব নাম হয়েছে, জানতে পারেন। বেগমের সাহিত্য প্রীতি দারুণ। তাই চেষ্টা করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে। কিন্তু মনোবাসনা সফল হয় না।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে অস্ত্র রাখার পদ্ধতিতে মুগ্ধ হন বেগম। বন্দুক, পিস্তল, কার্তুজ রাখার ভিন্ন ব্যবস্থা। ভূপালে ফিরে সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। নবাব পরিবারের ও সৈন্যদলের অস্ত্র রাখার আলাদা ব্যবস্থা।

কলিকাতা থেকে সুন্দর বাতিদান, বিলেতী বস্ত্র, কন্যা সুলতান জাহানের জন্য রকমারী খেলনা কিনে রেল ডিব্বা ভরে ফেলেন বেগম সাহেবা।

কলিকাতায় থাকা কালে বয়স্ক ইংরেজ পলিটিক্যাল অফিসার ওর কাছে আসেন সম্মান প্রদর্শন করতে। কথার ছলে শাহ্‌জাহান বেগমকে গোপনে সদুপদেশ দেন দ্বিতীয়বার শাদী করতে। ওর এমন কি বয়স? কয়েক দিন পর গভর্নর জেনারেলও তারই পুনরাবৃত্তি করেন।

কলিকাতার চাকচিক্য আর উত্তেজনায় চাপা পড়ে যায় উপদেশ। ভূপালের শান্ত পরিবেশ যেন নূতন করে চিন্তিত করে বেগমকে। কি করা যায়? ফের সমস্যা দেখা দেবে? বর কে হবে? এখন তো নিজেরই বয়স হয়েছে। অতএব বর একটু বয়স্ক হওয়া চাই। কোথায় সে।

অন্তরের খবর প্রকাশ হতেই হৈ হৈ শুরু হয়।

ইংরেজ সরকারকে লেখা হল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অনুমতি চেয়ে। মুসলিম ধর্মে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহে বাধা নেই। ইজিপ্টে, ইরানে এমন হয়। আর ইংরেজরাতো এরূপ করেই। এমন যুক্তি দিয়ে দলিল পেশ করেন নবাব সাহেবা। অনুমতি পেয়ে যান। তবে মৌলবীরা বাধা দেবার চেষ্টা করে। তবে আত্মীয় স্বজনের সহায়তায় যাকে বর হিসাবে খুঁজে পাওয়া গেল, তিনিও রাজ কর্মচারী, প্রথম পতির মতই। প্রধান কাজী নিকা করাতে রাজি হন।

বরের নাম সাদিক হাসান। আজকের কাজ কালের জন্য উনি ফেলে রাখেন না। সততার জন্য সুনাম আছে। মীর ডাবির উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সুপুরুষ। লম্বা। বেগমের মন জয় করার মত চেহারা। কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করার কারণ অজ্ঞাত। আরবী, উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি আছে।

শুভ লগ্নে বিয়ে হয়।

প্রথম স্বামীর মত, সাদিক হাসানকেও পদবী দেওয়া হয়। অনুমতি আসে। দরবারের তরফ থেকে ছত্রী, ঘোড়া, হাতি, পাল্কী দেওয়া হয়। বার্ষিক টাকা নির্ধারিত হয়। মোতিমিদ-উল-মহম উপাধিতে ভূষিত করা হয় দ্বিতীয় স্বামীকে।

প্রথম স্বামীর রিক্ত স্থান পূর্ণ হলো। আবার জীবনের মোড় ঘোরে। পালে

বাতাস লাগে। কিন্তু মানুষ যখন খুশিতে ডগমগ হয়, অন্ধকার দিকটা দেখে না। লুপ্ত আনন্দকে পুনরুদ্ধার করতে তখন শাহজাহান বেগম মগ্ন।

ছোট মেয়ে সুলতান জাহান এখন পঞ্চদশী। মার দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণ ভাল চোখে দেখে না। ও ক্ষুব্ধ। ওর মা আর নিজের নেই। পর যেন। রাতে ঘুম আসে না। অস্থির।

পঞ্চদশীর বুকে ঝড়। কিন্তু মা বুঝতে পারে না। কিছুদিনের জন্য অবশ্য তা' ভুলে যায় কন্যা সুলতান জাহান।

বম্বেতে বৃটিশের দরবারে যোগ দিতে যায় সবাই। বেগম শাহজাহান, পতি ও কন্যাকেও সাথে নেন। কলিকাতার পুনরাবৃত্তি হয়। সন্ধ্যায় ভারতীয় নৃত্যের আসর বসে। বাহবা বাহবা করে সবাই। পরে বল ড্যান্স। গাউন পরে মেম সাহেবরা তাল ঠোকে পুরুষের বাহুলগ্না হয়ে। শরীর ভাল নয়—অজুহাত দেখিয়ে শাহজাহান বেগম যায় না। বম্বের পর গুজরাত ঘুরতে যান বেগম। বহু ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করে ভূপাল ফেরেন।

প্রথমে কলিকাতা, পরে বম্বের টাঁকশাল মনকে প্রভাবিত করে। শাহজাহান বেগম ভূপালে টাঁকশাল স্থাপনা করেন। তবে বৃটিশ, জয়পুর ও হায়দ্রাবাদের প্রচলিত টাকার চেয়ে এর দাম কম বলে স্বীকৃত হয়। কারণ, ভূপালের মুদ্রা আকারে ছোট।

ভূপালে ছাপাখানা বসান। অমদাত-অল-আকবর বলে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন নবাব। রাজ্যের খবর ইংরেজীতেও প্রকাশিত হয়, এই কিন্তু প্রচেষ্টা সফল হয় না। ক্রেতা কোথায়? পরে ছাপাখানা থেকে সরকারী দলিল ও স্কুল পাঠ্য পুস্তক বের করা শ্রেয় ভাবেন নবাব সাহেবা। শাহজাহান বেগম কবিতাও লিখতেন উর্দু ও হিন্দীতে। সরকারী ছাপাখানা থেকে ওর কাব্যগ্রন্থ 'দীদারে শেরী' ছাপা হয়।

২৬

শাহজাহান বেগমের কোন পুত্র সন্তান হয় না। ভবিষ্যতে কন্যাই ভূপালের গদীতে বসবে। স্নেহের দৃষ্টি রয়েছে সর্বদা কন্যার উপর।

ষোড়শী চঞ্চলা। মহল থেকে বাগিচা, সদর মঞ্জিলের গুপ্ত পথ ধরে, তালাবের ধারে, সন্ধ্যার কোলে, প্রজাপতির বাহার ধরে ঘুরে বেড়ায় সুলতান জাহান। নূতন পিতা ওকে খুব ভালবাসে কিন্তু সুলতান জাহানের পছন্দ নয় সৎপিতাকে।

বাপের বেটি। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। মনের তেজও প্রকাশ পেতে দেরী হয় না।

গড়গড়ার নল থেকে ধুঁয়া বের করে, নবাব সাদিক হাসান বেগমকে বলেন—শাহজাদীর জন্য বর তালাশ করা দরকার।

—তাড়া কিসের ?

—বয়স বাড়ছে। খোঁজ করতেও তো সময় লাগবে।

—কেন ? আমার দিকে দেখে এমন ভাবছ নাকি ? আমার সময় অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল বলে—

—বললে কি অন্যায় হবে।

—না, অন্যায় হবে কেন। তবে শাহজাদীর বিয়েব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক করা আছে।

—কি বকম! কৈ, আগে তুমি কিছু বলোনিতো ?

—সেরূপ পবিস্থিতি এখনও আসেনি। কথাটা গোপনীয়। তবে মনে হচ্ছে এবাব প্রকাশ করার সময় এসেছে।

—মানে, কিছু জটীল ব্যাপার নাকি ? শাহজাদীর কোন খাস পসন্দ

—না, না। জামাই পছন্দ করে গেছেন আমার মা।

—কে সে ? কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

—না, বহুদিন আগে যখন মা আগ্রায় গিয়েছিলেন, তখন এই ব্যবস্থা কবেন। জালালাবাদ থেকে নয় বছরেব মিঁয়া আহমদ খানকে ভূপালে আনেন। জালালাবাদ ও ভূপালের ঘরনা একই। এই চিন্তা করে মা'র ছেলে চয়ন মনপুতঃ হয়।

—সে এখন কোথায় ?

—বলছি, বলে খিল খিল করে ওঠেন প্রৌঢ়া বেগম।

সাদিক খানের তামাক খাওয়া বন্ধ হয় শাহজাহান বেগমের গুপ্ত খবর শুনে। গড়গড়ার নল হাতের মাঝে দুলছে।

—ওকে এনে সরকারী মেহমানখানায় যত্নে রাখা হয়। পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার ইচ্ছা ছিল, ও বড় হলে সুলতান জাহানের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে।

—বাঃ বাঃ! দারুণ ব্যাপার।

—হাঁ। কিন্তু হঠাৎ করে, মা দেহত্যাগ করায় ওই কার্য পুরা করা হয় নি।

—তাহলে কি সে পরিকল্পনা ত্যাগ করেছো ?

—হয়তো করতাম। কিন্তু না, মার মৃত আত্মা'র দিকে তাকিয়ে, এরূপ করা অন্যায় হবে। আর মেয়েও জানে ব্যাপারটা একটু একটু। মনের গভীরে কিছু বাসনা পোষণ করতেও পারে সে।

—তাহলে আর দেরী করা উচিৎ নয়। এর জন্য সবাই তোমাকে প্রশংসাই করবে, স্বর্গত মার কথা রক্ষা করার জন্য।

—হাঁ, তাই ভাবছি, কালই গভর্নর জেনারেলের কাছে একটা পত্র পাঠিয়ে দেবো। ছেলেটি খানদানী বংশের, কাজেই ইংরেজ সরকার আপত্তি করবে না। খোদা ওদের জুটিকে সেলামত রাখুন।

ঠিকই, বৃটিশ সরকারের অনুমতি আসতে দেরী হয় না।

বিয়ের কথা রাজ্যে ঘোষণা করা হয়। দরবার বসে। বিয়ের কথা পাকাপাকি ভাবে ঘোষিত হয় পলিটিক্যাল অফিসারের সামনে।

নিমক বাসী করার দিন ধার্য হয়। অর্থাৎ নুন খাওয়া প্রথা পালিত হয়।

ধুমধাম করে বিয়ে হয়। প্রজারা খুব খানাপিনা করে। কর্মচারীরা উপহার পায়। সানাইয়ে ধুন বাজতে থাকে রাতের হিমেল বাতাসে। মধুর নিমন্ত্রণ নব পরিণীতাদের—একে অন্যের কাছে আসার।

শাহজাহান বেগম, মেয়ের বিয়েতে একটু বিচলিত হন। মেয়ে ওঁর প্রথম স্বামীর সন্তান। আর একমাত্রতো বটেই। নিজের মা বেঁচে নেই। মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন নবাব সাহেবা। খুশির অশ্রু বয়। অবশ্য মেয়েতো আর কোথাও যাচ্ছে না। এই মহলেই থাকবে।

ঈশান কোণের অল্প মেঘ যেমন সব সময় নজরে আসে না, রাজপরিবারের ভিতর অন্তঃকলহ তেমনই সব সময় প্রকাশ পায় না। প্রথমে ফুস্ ফুস্ শব্দ পরে টগবগ করে ফুটন্ত রূপ নেয়। কোথা থেকে কি হয়, বোঝা যায় না ···কিন্তু যখন পরিণতি সামনে আসে তখন হায় হায় রব ওঠে।

ইংরেজ সরকারের চিঠি আসে।···চিঠি কোথায়? এ যে তোপের গর্জন। ভূপালের শান্ত তালাবে তরঙ্গ ওঠে।...সাদিক হাসানকে পদবীচ্যুত করা হয়েছে। নবাব উপাধি ও দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদ থেকে ওকে সরিয়ে দিয়েছে বৃটিশ সরকার। ইংরেজের কেশর ফুলেছে। রোষ ফেটে পড়েছে।

নবাব শাহজাহান বেগম মিনতি করে চিঠি পাঠান, কেন এমন করা হল। আর ওর স্বামীর নবাব উপাধি পুনরায় বহাল করা হোক।

ইংরেজ বড় শক্ত জাত। পলিটিক্যাল অফিসার 'না' শব্দ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। আসল ব্যাপার নবাব শাহজাহান বেগমের জানতে দেরী হয় না। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে জামাতা নবাব আলি খানের সাথে ইংরেজ প্রতিনিধি হেসে কথা বলেন, কিন্তু নবাবের প্রতি তাঁর উপেক্ষার ভাব স্পষ্ট। গূঢ় বিষয়ক কোন কথা হয় না।

ক্রমে শাহজাহান বেগম জানতে পারেন সাদিক হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। উনি নাকি ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে জড়িত। ইংরেজের ধারণা ওয়াহাবী আন্দোলনকারীরা বৃটিশদের হত্যা করতে চায়। ওরা রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করবে।

শাহজাহান বেগম সরকারকে জানাতে দ্বিধা করেন না যে ওর কন্যা আর জামাতা এর জন্য দায়ী। ওরা মিথ্যে করে গভর্নর জেনারেলকে উসকানী দিয়েছে। বেনামী চিঠি যায়...নবাব সাদিক হাসান ওয়াহাবী মতে বিশ্বাসী। সে প্রশাসনকে তছনছ করে দেবে, ইংরেজদের খতম করবে।

মেয়ে সুলতান জাহান বেগম কিন্তু অন্য কথা বলে সৎপিতা সম্বন্ধে। অভিযোগ করে, অসৎ চরিত্রের লোকেরা সর্বদা ওকে ঘিরে থাকে। তাদের উচ্চপদ দিয়ে খুশিমত কাজ করান। ভ্রষ্টাচারকে আমল দিচ্ছেন উনি।

সাদিক হাসান পার্সি ও উর্দু ভাষায় বিদ্বান। ওয়াহাবী মতের বিষয়ে কিছু বই অনুবাদ করেছেন। ওয়াহাবী মত মক্কা, ইরানে প্রভাবশালী। ভারতে এর কোন প্রভাব নেই। সাদিক হাসান বোঝাতে চান যে বড়লাট লর্ড রিপন পূর্বে ওঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। কাজেই ইংরেজের এ অভিযোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন।

তবু কিন্তু ইংরেজরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন নবাবকে। যেহেতু ও ওয়াহাবী ধর্ম সম্বন্ধে বই লিখেছেন, কাজেই হয়তো ঐ মতাবলম্বী। আসলে সাদিক হাসান বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতের ওয়াহাবীরা মদ্যপান হতে দূরে থাকবে, হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা পরিধান করবে। কিন্তু বৃথা তর্ক।

ইংরেজ অনড়। কোন কথা শুনতে চায় না। যার সম্বন্ধে কু-ধারণা জন্মায়, তা' বদলানো মুশকিল। কোন মতেই না।

পদবী বিহীন অবস্থায় দুঃখী নবাব সাদিক হাসান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওঁর মৃত্যুর পর, ফের শাহজাহান বেগম, ইংরেজ সরকারকে পত্র দিয়ে অনুরোধ

করেন। অন্ততঃ এখন সরকারী নথিপত্রে, বেগমের সাথে মৃত নবাবের নামও যেন উল্লেখ করা হয়। মৃত আত্মা শান্তি পাবে। ইংরেজ রাজি হয় এ প্রস্তাবে। কারণ সাদিক হাসান এখন মৃত। ভয়ের আর কি? বরং বেগম সাহেবা প্রসন্ন হবেন।

শাহজাহান বেগমের দুঃখটা ঋতু পরিবর্তনের মত। যেমন গ্রীষ্মর পর বর্ষা পরিবর্তন আনে প্রকৃতিতে। বাবাকে যখন হারিয়েছে তখন ঠিক জ্ঞান হয়নি ওঁর। প্রথম পতি পাবার সুখ ক্ষণস্থায়ী হয়। তারপর মা অকালে চলে যান। যাকে বার্ধক্য বলে, সেই জরা মাকে কাবু করতে পারেনি। অথচ জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে, দিদিমা তখনও বেঁচে। মা পাশে রইলো না। মা যে বাবার স্নেহও দান করেছেন।...বয়স ঢলের দিকে, দ্বিতীয় স্বামীকে পেয়েও, তাকে ধরে রাখতে পারেননি।

এবার তো একা। নিঃসঙ্গ।

কন্যা সুলতান জাহান বেগম আছে এই প্রাসাদের মধ্যেই, সুখ, বৈভবের মাঝে, সন্তানাদি নিয়ে। বাৎসরিক টাকা নির্ধারিত। ইংরেজের হুকুম মাফিক জায়গির আছে ওর নামে, জামাতার নামে। সদর মঞ্জিলে থেকেও মার সাথে সাক্ষাত কম হয়। দুঃখই দুঃখ। সীমাহীন আফশোষ।

মনটাই ভেঙে গেছে নবাব সাহেবার। দেহ আর কত টানবে। খাঁচা থেকে সুখের পাখি উড়ে গেছে। আর বেঁচে কি লাভ?

শাহজাহান বেগম ভোগের মধ্যে থেকেও, ভুগেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। বাঁ গালে বিষম ক্যানসার রোগ দেখা দেয়। আর তাই কাল হল তাঁর।

নূতন ভূপালের কল্পনা বিলাসী নবাব চলে গেলেন দুনিয়া থেকে।

গদীতে বসেন সুলতান জাহান বেগম।

অতীতের বহু কিছু আজ হারিয়ে গেছে। যাচ্ছেও ক্রমশঃ। বহু সৌধ, বিশাল ফটক, বৃহৎ দ্বার নিশ্চিহ্ন।...রাজা ভোজের প্রাসাদ, দোস্ত মহম্মদ খানের ফতেগড় কেল্লা বিলীন।...ভেঙে ফেলা হয়েছে। ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, মুছে ফেলা হয়েছে অতীতের স্মৃতিকে। নূতনের রাজত্বে মূক পুরাতন সাক্ষীকে কি রাখা যেত না?...জর্দা, পর্দা, গর্দার শহর দ্রুত বদলাচ্ছে নূতনের ডাকে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে বুকে ধরতে।

বড় তালাবের জলে কিন্তু চাঁদের মোহিনী কিরণ এখনও চিক চিক করছে। দিচ্ছে মিষ্টি হাতছানি।...ভবিষ্যতের...কি?...কে জানে...

———